পায়ে হেঁটে লন্ডন

কমোডোর (অব.) এম আতাউর রহমান

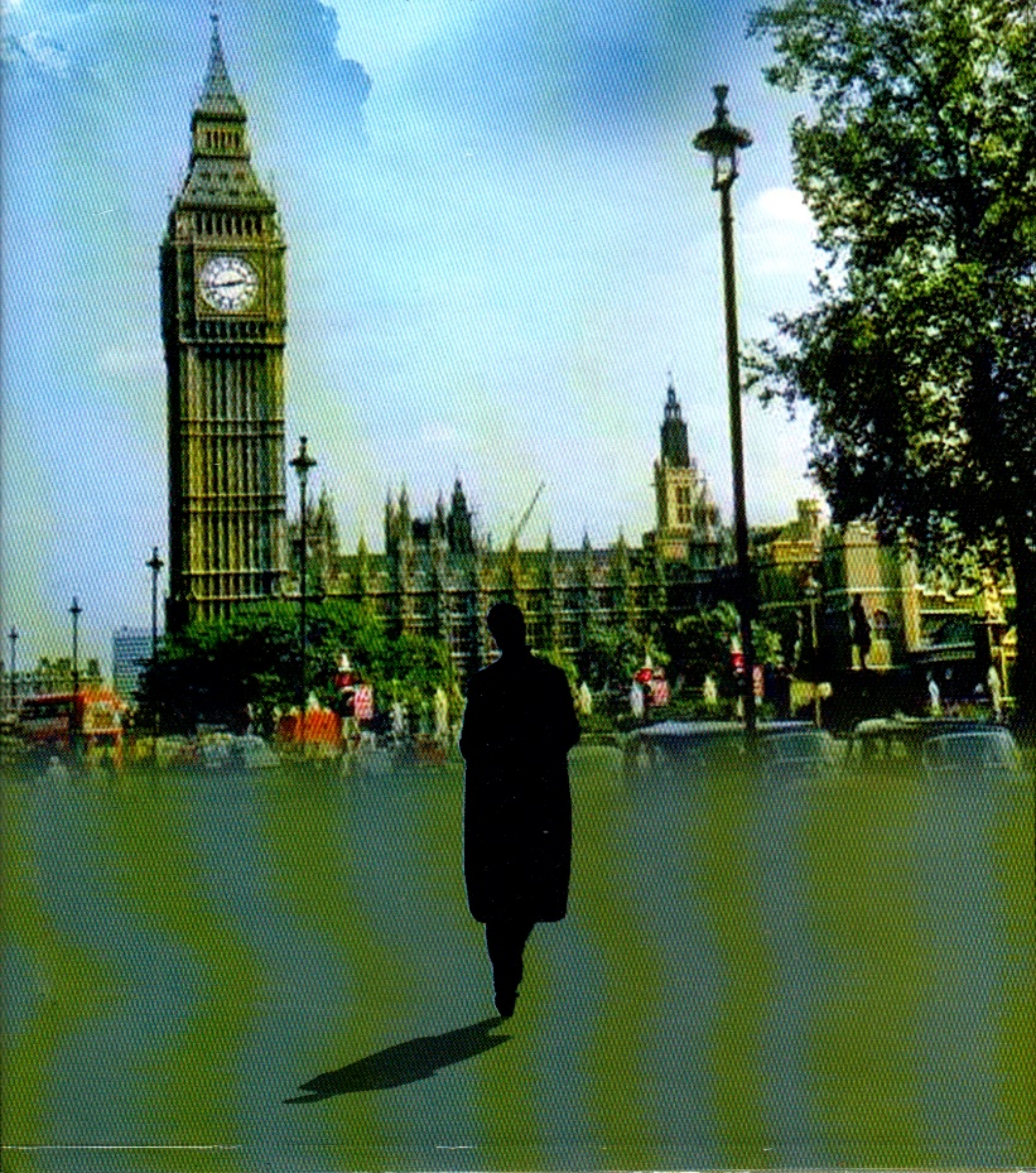

১৯৮১ সালে তিনি Concope (Consultative Committee of Public Enterprises) প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর এর সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। মানবসম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গণচেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে ব্যাংকটিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং চেয়ারম্যান হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সংস্থাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ২০০৪ সালে তিনি দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের চেয়ারম্যান হিসেবে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকাটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন, যা বর্তমানে শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোর অন্যতম। তা ছাড়া ইন্টারন্যাশনাল রোটারিসহ বহু জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং এখনো করছেন।

প্রকাশক

www.pathagar.com

পায়ে হেঁটে লন্ডন

রিদা রিসার্চ ইনস্টিটিউট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পায়ে হেঁটে লন্ডন

কমোডোর (অব:) এম আতাউর রহমান

www.pathagar.com

পায়ে হেঁটে লন্ডন

কমোডোর (অবঃ) এম আতাউর রহমান

প্রকাশক

আলেয়া বেগম সুমী
রিদা রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৪৮/এবি পুরানা পল্টন, ষষ্ঠতলা
ঢাকা ১০০০ । ফোন : ৭১৭১৯৭৫

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০০৬

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

হামিদুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

ডিজাইন বাজার
৪৮/এবি পুরানা পল্টন, ষষ্ঠতলা
ঢাকা ১০০০ । ফোন: ৭১৭১৯৭৫

দাম : ১৫০ টাকা
Price : $ 6.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ভ্রমণপিয়াসীদের উদ্দেশে

নিবেদিত

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

জীবন তরঙ্গ	১৯৯৬
সুইডেন শান্তির দেশ	১৯৯৮
আরব বিচিত্রা	১৯৯৮
পুরনো সেই দিনের কথা	১৯৯৯
অবরুদ্ধ দিনগুলো	১৯৯৯
আফ্রিকার বেনিনে	২০০০
পথে প্রান্তরে	২০০০
মার্কিন মুলুকে	২০০১
ইন্দোচীন সফর	২০০২
বিচিত্র ভারত	২০০৪
হিমালয়ের কোলে নেপাল	২০০৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

'ভ্রমণসাহিত্য' পাঠকনন্দিত বিষয়। কিন্তু পাঠক চাহিদার তুলনায় ভ্রমণসাহিত্যের পরিমাণ বাংলায় যথেষ্ট নয়। এর প্রধান কারণ ভ্রমণকাহিনী লেখার জন্য বিশেষ মনের প্রয়োজন হয়। পেশাগত কারণে দেশ-বিদেশে অনেক সফর করেছি কিন্তু একটি সরস কাহিনী লেখার দায়বোধ করিনি। ভ্রমণবিষয়ক লেখার জন্য যে মন ও বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা হয় অলস না হয় দায়বোধ জাগ্রত করতে পারিনি। সেই অভাব অতি সহজে পূরণ করেছেন লেখক কমোডোর (অব:) এম আতাউর রহমান। ভ্রমণপিয়াসীদের জন্য নিবেদিত 'পায়ে হেঁটে লন্ডন' কমোডোর (অব:) এম আতাউর রহমানের প্রকাশিত দ্বাদশতম গ্রন্থ। ভ্রমণকাহিনী পাঠককে এক জীবন্ত ছবির রাজ্যে প্রবেশ করায়, তেমন করে লিখতে হলে যে মন ও মনন প্রয়োজন তার মুন্সিয়ানার ধারার সাক্ষর কমোডোর রহমান তাঁর প্রতিটি ভ্রমণকাহিনীতে রেখেছেন।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র', আবদুল ওয়াহাবের 'দেখে এলাম রাশিয়া', প্রফেসর আবদুল হাইয়ের 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' তেমনই সাড়াজাগানো ভ্রমণকাহিনী। ইবনে বতুতা প্রমুখদের ভ্রমণকাহিনী শুধু কাহিনী বা সাহিত্য নয়। সেগুলো কালের সাক্ষ্য, প্রামাণ্য ইতিহাস। প্রতি বছরই দু-চারটি করে ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা হয়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে। এর কতটি সাহিত্য মানে উন্নীত, কতটি নয়, সে বিচারের দায় সাহিত্য সমালোচকদের। তবে আমার বিবেচনায় ভ্রমণকাহিনীর সাহিত্য মানের চেয়ে পাঠকপ্রিয়তার বিষয়টি বড়। কারণ ভ্রমণকাহিনী সবচেয়ে বেশি পঠিত বিষয়। পাঠক যা দেখেনি তা জানতে চায়, বর্ণনা আর ভাষার মানে উৎরে গেলে ভ্রমণকাহিনী পাঠক-চাহিদা মেটায়। ভ্রমণ সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ সহজাত এবং খোদা-প্রদত্ত। স্রষ্টা নিজেই তার বান্দাকে জমিনে ঘুরে বেড়াতে

www.pathagar.com

বলেছেন। অনুসন্ধিৎসু মনে তার অপার মহিমা, সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং রূপময়তার ভেতর অপূর্ব নিদর্শন খুঁজতে বলেছেন। আমার ইউরোপে প্রথম সফরে প্রথম দিনেই আমার আমন্ত্রণকারী বলেছিলেন কোনো শহরকে ভালো করে জানতে হলে পায়ে হেঁটে দেখতে হবে। বক্তব্যটি অত্যুত্তম সত্য।

সফর বা ভ্রমণ ব্যয়সাধ্য এবং শারীরিকভাবে কষ্টকর কিন্তু রোমাঞ্চকর। একই সঙ্গে উপজীব্যও। এ জন্যই সব ভাষাতেই ভ্রমণবৃত্তান্ত বা সফরনামা ইতিহাসনির্ভরতা ও তথ্য-উপাত্তের কারণে সবচেয়ে সুখপাঠ্য। এর প্রধান কারণ পাঠক অবচেতন মনে পরিব্রাজক বা পর্যটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। লেখকের বর্ণনায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। অচেনা ও অদেখাকে দেখার এক অদম্য আগ্রহ পাঠক লেখকের সঙ্গেই সফর করেন।

'পায়ে হেঁটে লন্ডন' তেমনই একটি নিটোল কাহিনী। শিরোনামের চমৎকারিত্বে পাঠককে আগ্রহান্বিত করতে বাধ্য। পাঠক ভাববেন, ঢাকা থেকে লন্ডন গমনের কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ আছে। আসলে লেখক মনের তাড়নায় ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন শহরটিকে পায়ে হেঁটে আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কার এ অর্থে, তিনি লন্ডন দর্শনের মাঝে এর আত্মা, ব্রিটিশ জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রাণস্পন্দন স্পর্শ করতে চেয়েছেন। লন্ডন নগরীতে পনেরো দিন পায়ে হেঁটে হেঁটে তিনি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন এর শেকড়। একটি সমৃদ্ধ জাতির অতীত, বর্তমান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস।

আমি একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। সাহিত্য সমালোচক নই। লন্ডন মহানগর আমিও দেখেছি কিন্তু সেটি আমার চোখে আমার মতো করে। লেখকের চোখে নয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে আলাদা না হলেও স্বকীয়তা রয়েছে। স্বাতন্ত্র্যের এ গুণেই বইটি পাঠক টানবে এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

লেখককে আমি একেবারে কাছ থেকে জানি। আত্মার আত্মীয় এ লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক কারণে। তার ভ্রমণপিয়াসু মন এবং সে মনের মাধুরী মেশানো গদ্যে আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়েছে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ লেখকের হায়াত আরো বাড়িয়ে দিন। ভ্রমণসাহিত্যে তার খ্যাতি ও যশের সঙ্গে এ বইটিও ইবনে বতুতার 'ভারততত্ত্বের' মতোই আবেদনের দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী হোক, এ কামনা করি।

ঢাকা
১৮.০৭.২০০৬

আলমগীর মহিউদ্দিন
সম্পাদক
দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

লেখকের কথা

দেশ ভ্রমণ একটা নেশা এবং এই নেশা পথিককে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। তখন নেশাগ্রস্ত পথিক সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে কাল্পনিক বিজয়ের স্বপ্নে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। প্রাচীনকালেও এই নেশার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন দেশের পরিব্রাজকগণ বছরের পর বছর একনাগাড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। ভ্রমণের অনিশ্চয়তা, ভ্রমণের বিপদ ও অসুবিধার কথা মনের কোণে ঠাঁই দেননি। বন্ধুর পথ অতিক্রমের সব জ্বালা সহ্য করার পর যে আনন্দটুকু আহরণ করা সম্ভব, তার জন্যই পতঙ্গের মতো অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, দিনের পর দিন বিপৎসঙ্কুল ও কণ্টকময় পথে এগিয়ে চলেছেন। মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন এরূপ আরো অনেক পরিব্রাজক পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি এবং অরণ্যসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে জ্ঞান আহরণ করেছেন– জানার নেশাটাই এখানে তাদের শক্তি জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে এবং তারা মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চলেছে। তারা এগিয়ে চলেছে বটে কিন্তু অজানা পথ, দু দিকের দৃশ্য, পারিপার্শ্বিক সমাজচিত্র, পথের পাশের মানবগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ তাদের হাসি-গান, তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং বেঁচে থাকার জন্য আনন্দ ও উৎসবের নিখুঁত বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এভাবেই তারা তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে দিয়েছেন ভবিষ্যতের আগ্রহী জনগোষ্ঠীর জন্য।

লন্ডনে প্রতি বছরই একবার করে যাই এবং সেখানে প্রায় মাসখানেক অবস্থান করি। লন্ডনকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখে চলে আসি কিন্তু কোনোবারই ঘনিষ্ঠভাবে লন্ডনকে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এবার দিন

www.pathagar.com

পনেরো সময় পাওয়া যাচ্ছে যখন আমার আর কোনো কাজ থাকবে না। তাই স্থির করলাম, লন্ডনকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে চেনার জন্য পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখব। এ ব্যাপারে আমার জামাতা ড. নিজামউদ্দিন আহমদ শুধু উৎসাহই যোগায়নি বরং ঢাকা থেকে ই-মেইলযোগে জানাল কোন কোন রুটে হাঁটলে লন্ডনের অন্তরাত্মাকে চেনা যায়। মূলত তার পরামর্শ নিয়ে এবং আরো কিছু বইপুস্তক ঘেঁটে কোন কোন রুটে যাব তার ফিরিস্তি ঠিক করে ফেললাম এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে ১৬ জুলাই ২০০৩ থেকে শুরু করে ৪ আগস্ট ২০০৩ সাল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে লন্ডন চষে বেড়ালাম।

পথ চলায় শারীরিক কষ্ট আছে বটে কিন্তু দিনভর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় তা ধীরেসুস্থে শুয়ে বসে উপভোগ করার আনন্দ কি কম বাঞ্ছনীয়? অনেকটা গোজাতীয় পশুর মতো আরামে-আয়েশে অর্ধ নির্মিলিত চোখে শুয়ে শুয়ে চর্বিত চর্বণের মতো আরামদায়ক। সেই আবছা আবছা স্মৃতি পুনরায় পাঠকের জন্য উপস্থাপনযোগ্য করে তোলাতে আছে মানসিক পরিশ্রম এবং সেই পরিশ্রমেরও পুরস্কার পাওয়া যায় যখন মুদ্রণ শেষে কোনো পাঠক এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

পথ চলতে চলতেই আমি লন্ডনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কিছু ধ্যান-ধারণা দিয়েছি, লিপিবদ্ধ করেছি লন্ডনের ইতিহাস। একটা দেশকে জানতে হলে সে দেশের সমাজব্যবস্থা, জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়। সে চেষ্টা আমি করেছি। তারপরও কোথাও অধিক বিবরণের দরুন হয়তো কোনো পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে এবং কোথাও সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশের জন্য কোনো পাঠকের জানার স্পৃহা অতৃপ্ত থাকতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই আমি পাঠকের কাছে আবেদন জানাব যেন আমার লেখার অপূর্ণতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোমের রাজা ক্লডিয়াসের লন্ডন জনপদ দখল করার পর থেকে ২০০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে সেই জনপদ বিশাল নগরীতে পরিণত হয়েছে। ক্রম উন্মেষের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ এই বইটিতে দেয়া হয়নি বটে তবে বইটি আগাগোড়া অধ্যয়ন করলে ইংল্যান্ড এবং ইংরেজ জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের একটা কাঠামো মনে ভেসে উঠবে। চলার পথে আমি যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি তারই পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে আমি

www.pathagar.com

ইংরেজদের চরিত্র তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এরা কতটা রক্ষণশীল, কতটা উদারপন্থী, কতটা দেশপ্রেমিক, কতটা বাস্তববাদী তার ধারণা পাওয়া যাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমার অভিমত থেকে। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু যখনই দেশ ও বিদেশের প্রশ্ন আসে তখন ইংরেজরা বিনা দ্বিধায় একান্তভাবে দেশপ্রেমিক। তাদের প্রতিটি চিন্তা, চেতনা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে তারা মনপ্রাণ দিয়ে গর্ব ভরে সমর্থন করে এবং তা বিশ্বসমাজে তুলে ধরতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

আমি ১৫ দিন লন্ডনের পথে পথে হেঁটেছি। আমার মনে হয়, এই অল্প সময়ে যা কিছু দেখেছি, যা কিছু অনুভব করেছি তাতে আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়েছে এবং উপলব্ধিবোধ অনেকটা পরিমার্জিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সুধী পাঠক এই বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন এবং অনেক কিছু শিক্ষণীয় পাবেন। এই বইটি পড়ে যদি কোনোভাবে উপকৃত হন তাহলে আমি মনে করব আমার প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করেছে।

এই বইটির অনেক অধ্যায়ই দৈনিক নয়া দিগন্তের সাপ্তাহিক 'অবকাশে' প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক পাঠকই এই সাপ্তাহিক সংখ্যাগুলোর সঙ্কলন চেয়ে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে 'পায়ে হেঁটে লন্ডন' বইটি মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

এই বইটি লেখার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের সবাইকে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যারা মুদ্রণ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

এম আতাউর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক.

ওয়েস্ট মিনস্টার

কোনো এককালে বিশ্বের বৃহত্তম নগরী ছিল লন্ডন। বিশ্ব ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি এবং আধিপত্যবাদীদের স্বর্গ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল এই লন্ডন। রানী ভিক্টরিয়ার আমলে পশ্চিমে কানাডা থেকে শুরু করে আফ্রিকা-এশিয়া হয়ে পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল লন্ডন। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইংরেজরাই ছিল বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি, যাদের সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে বলা হতো এখানে সূর্য ডোবে না। সেই সাম্রাজ্যের ভিত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই নড়বড়ে হয়ে যেতে থাকে এবং ব্রিটিশদের শান-শওকত কমে যেতে থাকে। সে ইতিহাস বলা আজকে আমার উদ্দেশ্য নয়– বর্তমানে আমি শুধু পাঁয়ে হেঁটে লন্ডন দেখতে চাই এবং পথে যেতে যেতে আমার অনুভূতির ধারাবিবরণী দিয়ে যেতে চাই।

লন্ডনের সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ১৯৫০ সাল থেকে এবং বহু বছর এখানে কাটিয়েছি। কখনো কখনো একনাগাড়ে ৩-৪ বছর, আবার কখনো কখনো কয়েক মাস এখানে কাটিয়েছি। বর্তমানে প্রতি বছরই মাস দেড়েক দুয়েকের জন্য লন্ডন যাওয়া পড়ে। আমার জ্যেষ্ঠকন্যা বীথিই চায় যে আমি তার সাথে লন্ডনে অন্তত মাসখানেক কাটাই। সে সূত্রেই আমার যাওয়া হয় এবং কয়েকটি দিন ছুটির আমেজে কেটে যায়। ঘরে যখন গৃহিণী নেই তখন নাতি-নাতনীদের সাহচর্যে দিন কাটানোর আকর্ষণও ঘর ছাড়তে উৎসাহ যোগায়।

লন্ডন ও ইংল্যান্ড আমার স্মৃতিতে ভাস্বর। চোখজুড়ানো শ্যামল সুসজ্জিত

www.pathagar.com

উদ্যানগুলো এবং কলেজ জীবনের স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবলি মনের সামনে ভেসে ওঠে। সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির আকর্ষণও আমাকে টেনে নেয় ইংল্যান্ডে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সাথে বলতে গেলে আমাদের মানে ভারতীয়দের ছিল নাড়ির যোগ। আমাদের চিন্তা-চেতনা আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ইংল্যান্ডের ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠেছিল। আমাদের আচার-আচরণ, আমাদের শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিতে ইংরেজদের প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পরও ইংরেজদের ধাঁচেই চলছে আমাদের প্রশাসন, আইন-আদালত, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য। আমরা প্রশাসনিক ব্যাপারে স্বাধীন সত্তা লাভ করেছিলাম বটে কিন্তু মনের দিক থেকে ইংরেজদের প্রচলিত ব্যবস্থাই জাতীয় জীবনে চালু রেখেছিলাম। আমি নিজেও ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছি। আমার কন্যারা সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং ছোটবেলায় তারা সেখানেই পড়াশোনা করেছে। তাই লন্ডনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দিন দিনই বেড়েছে।

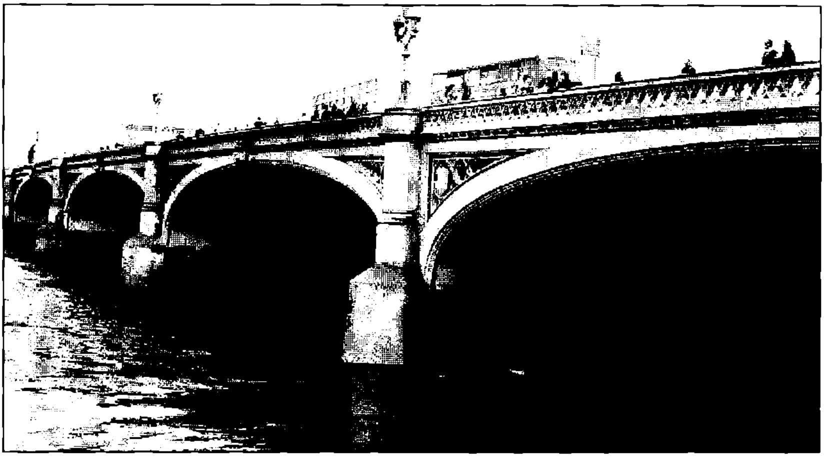

ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ

লন্ডনে প্রতিবারই যাই এবং লন্ডনকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখে চলে আসি। আরো ঘনিষ্ঠভাবে লন্ডনকে দেখতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে না। এবারে দিন পনেরো সময় পাওয়া যাচ্ছে তাই, স্থির করলাম যে লন্ডনকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে চেনার জন্য পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখব। এ ব্যাপারে আমার জামাতা ড. নিজাম শুধু উৎসাহ যোগাল না বরং ঢাকা থেকে ই-মেইলে করে জানাল কোন কোন রুটে হাঁটলে লন্ডনের অন্তরাত্মাকে চেনা যায়। মূলত তার পরামর্শ নিয়ে এবং আরো

www.pathagar.com

কিছু বই-পুস্তক ঘেঁটে কোন কোন রুটে যাব তার ফিরিস্তি ঠিক করে ফেললাম এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম।

বীথি পইপই করে বারণ করতে থাকল যে এভাবে হাঁটতে গেলে কোনো অসুখ বিসুখ না বাঁধিয়ে বসি এবং এ বয়সে এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া সঙ্গত হবে না ইত্যাদি। কিন্তু ভ্রমণে যে নেশা আছে সেটা তো আর বীথি জানে না, তাই তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এবং তার উপদেশগুলো মেনে চলব ইত্যাদি ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করে ১৬ই জুলাই ২০০৩ সালে ছাতি-লাঠি ও থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম লন্ডন দেখতে। প্রথম ঘণ্টাতেই লাঠি হারিয়ে ফেললাম, তাই মনের শান্তিও একটু বিঘ্নিত হলো। এখানেই বলে রাখি, লন্ডনে আমার লাঠি আরো কয়েকবার হারিয়েছি। কখনো টিউবস্টেশনে কখনো কোনো দোকানে এবং কখনো বা কোনো পার্কে। প্রতি বারই খোঁজ করে আমি তা পেয়েছি। পার্কে লাঠি পড়ে থাকলেও কেউ তা তুলে নিয়ে যায় না। দু দিন পরে গিয়েও লাঠি যে বেঞ্চে ভুলে ফেলে রেখে এসেছিলাম সেখানেই পাওয়া গিয়েছে। তাই লাঠি হারিয়ে যাওয়াতে আমি দমলাম না। আমি এগিয়ে চললাম। আমার বিশ্বাস, আমি ফেরত পাব এবং সে বিশ্বাস মনে পোষণ করেই আমি এগিয়ে চললাম।

ওয়েস্ট মিনস্টার টিউব স্টেশন থেকে আমি পার্লামেন্ট ভবনের দিকে রওনা হলাম। টিউবস্টেশনের সাথেই ক্যাবিনেট ওয়ার রুম ছিল কিন্তু সেখানে যাওয়ার প্রবৃত্তি হলো না। প্রথম যুদ্ধের সময় স্যার উইনস্টন চার্চিল ভূনিম্নের এই ওয়ার রুমে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা এবং সরকার পরিচালনার কাজ করতেন। প্রায় ১ কিলোমিটার পথ হেঁটে পার্লামেন্ট ভবনে পৌঁছলাম।

প্রথমেই নজরে এল প্রথম রিচার্ডের (১১৫৭-১১৯৯) "The Lion hearted" এর ঘোড়ায় সওয়াররত অবস্থার প্রস্তরমূর্তি পার্লামেন্ট ভবনটির পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইনি ক্রুসেডে যোগ দেন এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

অলিভার এর প্রস্তরমূর্তিও দেখলাম। (১৫৯৯-১৬৫৮) এই মূর্তির নিচে একটা সিংহ বসানো রয়েছে। ইনি ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন সাধারণ নাগরিক, যিনি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভ করে ইংল্যান্ডের রাজার স্থান দখল করেন।

প্যালেস অব ওয়েস্ট মিনস্টার এ হাউস অব পার্লামেন্ট অর্থাৎ পার্লামেন্ট ভবন অবস্থিত। প্রতিবারই আমরা এই অঞ্চলে আসি পার্লামেন্ট ভবন, বিগবেন ও ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে দেখতে যাই এবং খোলসটা দেখেই চলে যাই। এবার এসেছি একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতে। কোত্থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত এসেছে তার ইতিহাস জানতে।

www.pathagar.com

এই ভবনটির ইতিহাস শুরু হয় রাজা এডওয়ার্ড দ্য কনফেসরের আমল থেকে। ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং এই ভবনকেই প্রশাসন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। এরপর ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে নরমান রাজা উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার রাজ্য জয় করে এখান থেকেই রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করেন এবং পরবর্তী ৪০০ বছর অষ্টম হেনরির রাজত্বকাল পর্যন্ত রাজার বাসস্থান অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ হিসেবেও এই পার্লামেন্ট হাউস ব্যবহৃত হতে থাকে। কিভাবে নরমান রাজা ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলেন তার বিবরণ পরে দেয়া হবে।

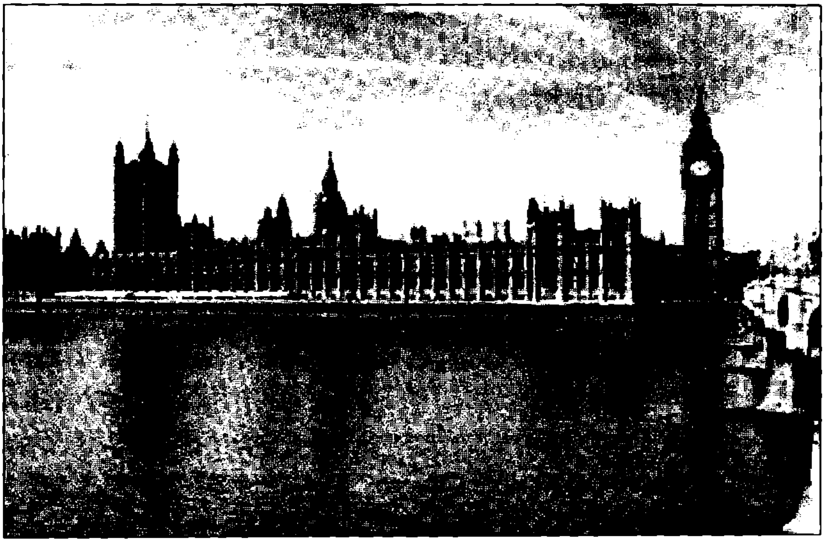

পার্লামেন্ট ভবন ও বিগ বেন

১৫১২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তার পর থেকে অদ্যাবধি এই ভবনটি রাজ্যের প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৮৩৪ সালে আবারও এই ভবনটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তখন এই ভবনটির পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে এটা গথিক স্টাইলে নির্মিত হবে এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে নতুন পার্লামেন্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং প্রায় ২০ বছর পর নির্মাণকাজ শেষ হয়। হাজার বছর ধরে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে এই ভবনটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বজা সমুন্নত রেখেছে এবং সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আইন পরিষদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নীতিনির্ধারণের

www.pathagar.com

কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের ভূমিকার চাবিকাঠি এই ভবন থেকেই হিলানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল আইন এখানেই প্রণীত হয়। এই ভবনেরই এক প্রান্তে হাউস অব কমন্স যেখানে গণনির্বাচিত ৬৫৯ সংসদ সদস্য সংসদীয় কার্য পরিচালনায় ব্যস্ত থাকেন। অন্য প্রান্তে হাউস অব লর্ডস যেখানে আইন পাসের জন্য অভিজাত শ্রেণী থেকে মনোনীত সদস্যগণ সাম্রাজ্যের আপিল পরিষদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। হাউস অব কমন্স সাদামাটাভাবে সজ্জিত এবং পূর্ণাঙ্গ সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তুলনায় বসবার স্থান কম বলে অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। হাউস অব লর্ডস কিন্তু খুবই জাঁকজমকের সাথে সাজানো হয়েছে। টেমস নদীর তীরে অতি মনোরম স্থানে এই ভবনটি অবস্থিত।

ভবনটির পাশ দিয়ে মার্গারেট স্ট্রিট যাচ্ছে। যুগের সাথে সাথে রাস্তা মেরামত হয় এবং ধীরে ধীরে রাস্তার উপরিভাগের উচ্চতা বাড়তে থাকে কিন্তু পার্লামেন্ট ভবনের ভিত্তি যেখানে ছিল সেখানেই আছে বিধায় পার্লমেন্ট ভবনের মেঝে বর্তমানে মার্গারেট স্ট্রিট থেকে প্রায় ১০ ফিট নিচে। ব্রিটিশরা খুবই রক্ষণশীল তাই ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এই বিশাল গথিক স্টাইলে নির্মিত ভবনটি এখনো প্রায় একই অবস্থায় রক্ষিত আছে।

পার্লামেন্ট ভবনের লাগোয়া উত্তর পাশেই লন্ডন শহরের অতি পরিচিত 'বিগ বেন' ঘড়ির টাওয়ারটি অবস্থিত। এটি একটি চৌকোণবিশিষ্ট ৩২০ ফিট উঁচু টাওয়ার, যা সেন্ট স্টিফেন্স টাওয়ার নামে পরিচিত। এই টাওয়ারের চুড়োতে ২৩ ফিট বর্গের 'বিগ বেন' ঘড়িটি স্থাপন করা হয়েছে। এই ঘড়িটির চারদিকেই ডায়াল রয়েছে। রাতেও এই ঘড়ি আলোকিত থাকে এবং বহু দূর থেকে চারদিক থেকেই দেখা যায়। বিগ বেনের নামটি এসেছে এর ১৩.৫ টন ওজনের বিখ্যাত বেলটির জন্য, যা ওয়েস্ট মিনস্টারের কমিশনার স্যার বেঞ্জামিন হল দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমার আঘাতে পার্লামেন্ট ভবনের কমন্স চেম্বারের কিছু ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু এই টাওয়ারের কোনো ক্ষতি হয়নি এবং এই ঘড়িটি বিবিসির সৌজন্য প্রতিটি সংবাদ পরিবেশনার আগে সর্বদা রীতিমতো বিশ্বব্যাপী ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে জানিয়ে দিত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইস্পাতদৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিগ বেনের ঘণ্টাধ্বনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ইংরেজদের মনোবল বৃদ্ধি করত বলে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত এবং এখনো করে থাকে। এই বেল নিয়ে ইংরেজদের গর্বের শেষ নেই।

www.pathagar.com

সুধী পাঠক জেনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, বিগ বেন টাওয়ারে একটি কারা কক্ষ আছে এবং সে কারা কক্ষে শুধু পার্লামেন্টের আইন ভঙ্গের অপরাধে পার্লামেন্ট সদস্যকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যায় এবং এই কারা গৃহে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখা যায়। তবে বর্তমান সংসদ সদস্যদের স্বস্তির বিষয় হচ্ছে, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে অদ্যাবধি কোনো সংসদ সদস্যকে এখানে কারাভোগ করতে হয়নি।

এবারে আমি ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেতে ঢুকছি। মার্গারেট স্ট্রিটের ওপরই অবস্থিত এই অতি সুন্দর গির্জাটি শপ্তদশ শতাব্দী থেকে উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গির্জার নির্মাণকাজ শুরু হয় ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দে। পার্লামেন্ট স্ট্রিটের উল্টো দিকে এই গির্জায় ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হ্যারল্ডের রাজ্যাভিষেক হয়। তার পর থেকে অদ্যাবধি ইংল্যান্ডের রাজা ও রানীদের রাজ্যাভিষেক (করোনেশন) অনুষ্ঠান এই গির্জাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। বর্তমান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথও এখানেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই গির্জাতেই সমাধিস্থ করা হয়েছে এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর, প্রথম এলিজাবেথ, কুইন মেরি, সপ্তম এডওয়ার্ড এবং আরো অনেককে। এখানে বহু রাজন্যকে সমাধিস্থ করা হয়। তাছাড়া অনেক কবি, রাজনীতিবিদ ও বীর যোদ্ধাকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে। চার্লস ডারউইন ও আইজ্যাক নিউটনের সমাধিও এখানেই রয়েছে।

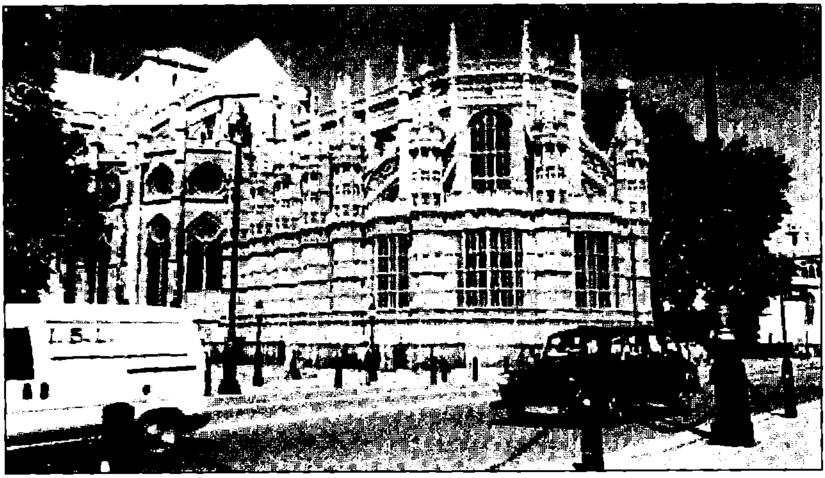

ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে

www.pathagar.com

১০৫০ খ্রিস্টাব্দে 'এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর'-এর আমলে এই অট্টালিকাটি তৈরি করা হয়। তিনিই ছিলেন প্রথম রাজা, যার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানটি ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই গির্জায় সম্পাদিত হয়। তখনো এটা অ্যাবের মর্যাদা পায়নি। সে আমলে করোনেশন চেয়ারটি ছিল ওককাষ্ঠনির্মিত সাদামাটা একটা বৃহৎ চেয়ার। (ইরানের বাদশার মার্বেল সিংহাসন, নাদেরি সিংহাসন অথবা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনগুলোর তুলনায় এটা ছিল অতি নিম্নমানের।) ১৩০৮ সালে দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের পর থেকে অদ্যাবধি শুধু পঞ্চম এডওয়ার্ড ও অষ্টম এডওয়ার্ড ব্যতীত সবাই এই সাদামাটা চেয়ারে বসেই রাজ্যাভিষেক করেন। রক্ষণশীল ব্রিটিশরা এই চেয়ারের কোনো সংস্কার করেনি। পঞ্চম এডওয়ার্ড ও অষ্টম এডওয়ার্ড এই দুই নৃপতির রাজ্যাভিষেক হয়নি। উল্লেখ, অলিভার ক্রমওয়েল, যিনি ছিলেন রাজবংশবহির্ভূত সাধারণ নাগরিক, তিনি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন তিনি Lord Protector হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শাসনভার গ্রহণের সময় এই চেয়ারটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছিল।

এবারে করোনেশন চেয়ারটির ইতিহাস একটু তুলে ধরা যাক। ওক কাঠ দিয়ে নির্মিত এই সাদামাটা চেয়ারটি নির্মিত হয় রাজা প্রথম এডওয়ার্ডে রাজ্যাভিষেকের জন্য। এই চেয়ারটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বসার গদির নিচে একটি বালিশ আকৃতির বেলে পাথর সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করা আছে। এটাকে স্কোনের পাথর বলা হয়। এই পাথরটির জন্যই এই সিংহাসনের মর্যাদা। ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'Stone of Scone' পাথরটি স্কটল্যান্ড অ্যাবে থেকে আনা হয়েছিল। অভিষেকের সময় রাজা কিংবা রানীর পদযুগল রাখার জন্য চারটি সিংহ স্থাপন করা হয়েছে পাদানি হিসেবে।

পাথরটিরও চমকপ্রদ ইতিহাস রয়েছে। খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ জেনেসিসের ২৮ অধ্যায়ে শ্লোক ১৮তে উল্লেখ আছে, জ্যাকব এই পাথরটিকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। জ্যাকবের পুত্র এই পাথরকে মিসরে নিয়ে যান। পরে মিসর থেকে এই পাথরটি স্পেনে স্থানান্তরিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে এই ৩৩৬ পাউন্ড ওজনের প্রকৃত বেলেপাথরটি আয়ারল্যান্ডে আসে এবং এটাকে LIAFAIL অর্থাৎ 'ভাগ্য প্রস্তর' হিসেবে সম্মানের সাথে রাজ্যাভিষেকের চেয়ারে স্থান দেয়া হয়। কথিত আছে যে সত্যিকারভাবে রাজকীয় রক্ত বহনকারী ব্যক্তি যদি এই চেয়ারে রাজ্যাভিষেকের জন্য বসতেন তাহলে চেয়ারটি শব্দ করে উঠত কিন্তু কোনো কপট যদি সিংহাসনের দাবিদার হয়ে এই চেয়ারে বসত তাহলে এটা নিশ্চুপ থাকত।

www.pathagar.com

এই বেলেপাথরটি পরবর্তীকালে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে একসময় স্কটল্যান্ডে চলে আসে এবং এই পাথরটির ওপর উপবেশন করেই ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের রাজা জন বেলিয়নের রাজ্যাভিষেক হয়।

স্কটল্যান্ড থেকে এই পাথরটিকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়। স্কটিশরা এই পাথরটিকে নিজেদের সম্পত্তি বলেই দাবি করে। দাবি পূরণ হয়নি বলে স্কটিশ জাতীয়তাবাদীরা ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে এই পাথরটি চুরি করে নিয়ে যায়। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে এটিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১৯৫২ সালের করোনেশনের পর এটাকে অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হয়।

১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর পাথরটিকে স্কটল্যান্ডে ফেরত দেয়ার ঘোষণা দেন। শর্ত থাকে যে করোনেশনের সময় পাথরটিকে ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেতে পাঠানো হবে। বর্তমানে পাথরটি স্কটল্যান্ডের এডিনবরা দুর্গে সংরক্ষিত আছে। করোনেশন চেয়ারটি পাথরবিহীন অবস্থায় ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেতেই বিরাজ করছে।

ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেতে গেলাম। কিন্তু ভেতরে ঢুকলাম না বিশেষ দুটো কারণে। প্রথমত লন্ডন দেখা আমার উদ্দেশ্য। কোনো বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকলে খুঁটিনাটি দেখতে অনেকটা সময় চলে যায়। এতে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য লন্ডন দেখা ব্যাহত হবে। তাই বাইরে বাগানে বসে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নিলাম, কিছুটা সময় আশপাশের দৃশ্য এবং লোকজনের আনাগোনা দেখে সময় কাটালাম এবং লন্ডনের ওপর একটি পুস্তিকা থেকে উপরোক্ত তথ্যগুলো এবং আরো অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করলাম।

লন্ডন শহরে প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি পর্যটক এসে থাকে। এরা যদি গড়ে প্রত্যেকে মাত্র ১০০০ ডলারও খরচ করে তাহলে বছরের শেষে দেখা যাবে যে ৩০০০ কোটি ডলার লন্ডন শহরটি পর্যটকদের কাছ থেকে আয় করে থাকে। বর্তমান টাকার মূল্যে ১০০ টাকায় পাউন্ড হিসেবে লন্ডন পর্যটন শিল্প থেকে বাংলাদেশের মুদ্রা মানে ৩ম০০,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করবে। পর্যটন শিল্পের যদি শ্রীবৃদ্ধি না করা হয় তাহলে কিভাবে লোক আকৃষ্ট করা যাবে? সেদিকে নজর দিয়েই ইংরেজরা তাদের পুরাতত্ত্ব পুরাকীর্তি অত্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে থাকে। সেগুলোই পর্যটকরা এসে দেখে যায়। আমাদের দেশেও বহু পুরাতত্ত্ব আছে কিন্তু সেগুলোকে মোটেই রক্ষণাবেক্ষণ করি না বরং ধ্বংস করে

www.pathagar.com

দিই এবং মনে করি যে নতুন করে আমরা নবউদ্যোগে শুরু করব। আমাদের ঐতিহ্য তাই গড়ে ওঠে না। আমরা নিজেরাই আমাদের পুরনো ইতিহাস মুছে ফেলি।

বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্প ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। আমার লিখিত প্রায় সব ভ্রমণ কাহিনীতে আমি সে বিষয়ে লিখছি। 'মার্কিন মুলুকে' বইটিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য সন্নিবিষ্ট করে লিখেছি কিভাবে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যটকদের অর্থেই বিরাট ধনী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। লিখেছি থাইল্যান্ডের নতুন চিন্তা ও চেতনার কথা। পর্যটক আকর্ষণ করতে তারা কিভাবে দেশটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছে এবং এখনো সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সমৃদ্ধি তাই আসছে। ভূমধ্যসাগরীয় ছোট একটি দ্বীপ 'মাল্টা' পর্যটকদের মেহমানের মতো দেখাশোনা করে বিধায় প্রতি বছর এখানে আসে লাখ লাখ অতিথি পর্যটক এবং নিয়ে আসে বস্তা ভর্তি ডলার। যে দেশটি সম্পূর্ণভাবে পানি, খাদ্য, বস্ত্র এবং যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য ব্রিটিশদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই মাল্টাই বর্তমানে একটা উন্নতিশীল ধনী দেশ। কী সেই সোনার কাঠি রুপোর কাঠি তারা পেয়েছে, যার ব্যবহারে তারা তাদের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছে। জীবনের সব মলিনতা দূরে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে দীর্ঘ ৬ বছর ধরে প্রতি বছরই কিছু সময় আমি মাল্টায় কাটিয়েছি। তখন দেখেছি তাদের দুরবস্থা। স্যুপ ও রাস্তার ধারের লম্বা রুটি এবং টমেটো স্লাইস সঙ্গে ঘরে তৈরি করা পনির দিয়েই তাদের খানাপিনা হতো। না খেয়ে থাকত অনেকে। ইতালি থেকে পানি না এলে পানির অভাবে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠত। সেই মাল্টাকে ২০০২ সালে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যে মাল্টাকে দেখে পঞ্চাশ দশকে মনে করুণার ভাব জাগত সেই মাল্টাকেই বর্তমানে দেখে ঈর্ষা হয়।

তারা সবই এগিয়ে যাচ্ছে আর বাংলাদেশীরা দিন দিনই কেন পিছিয়ে যাচ্ছি? কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে আমাদের স্বভাব হচ্ছে স্থিতু হয়ে ঘরে বসে থাকা। কোনো প্রকারে দিন আল্লাহই চালিয়ে নেবেন এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই আমরা আমাদের দিন কাটাই। আমাদের দেশের দিনমজুরদের স্বভাবই হচ্ছে দিন আনা দিন খাওয়া। সুধী পাঠক, সবাই জানেন যে দিনমজুরদের দু-পয়সা হাতে এলে তা না শেষ হওয়া অবধি তারা শুয়ে-বসে কাটাবে। কাজে বেরোবে না। পেটে যখন টান পড়বে তখন তারা বেরোবে কাজের সন্ধানে। তাই 'দিন আনি দিন খাই' নীতিতেই আমরা চলি। আমাদের সচ্ছলতা আসবে কিভাবে? আমাদের প্রয়াস নেই। নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে নতুন কর্মক্ষেত্রের উদ্ভাবন করে কাজ জুটিয়ে নেয়ার স্পৃহা ও আগ্রহ আমাদের নেই। এগিয়ে গিয়ে জয় করার তাগিদ

www.pathagar.com

যেন আমাদের নেই। তাই আমরা অভাবগ্রস্ত এবং সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাও আমাদের নেই। বিশ্বমানচিত্রে আমাদের অবস্থান দিনদিনই কেন অধোগামী হচ্ছে তার সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে, কী দুর্বলতা আমাদের আছে যা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা আমরা করতে পারি? এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার জন্যই ওপরে কটি লাইন লিখলাম। বাঙালি চরিত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে আমি লিখিনি।

বর্তমানে লন্ডনে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন হচ্ছে বিদেশী। ১৯৫০ সালে যখন প্রথম লন্ডনে এসেছিলাম তখন হিথরো বিমানবন্দরের অবকাঠামো বলতে ছিল একটা রানওয়ে (বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য লম্বা এক ফালি প্রায় ১০০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা), কয়েকটা ব্যারাক টাইপ শেড (চালা ঘর), প্রচণ্ড শীত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বড় বড় কেরোসিন/প্যারাফিন স্টোভ, যা যাত্রীদের লাউঞ্জেই রেখে দেয়া হতো। সেখান থেকে তারা কোথায় এগিয়ে গেছে তা কল্পনাও করা যায় না। সে সময় সাদা আদমি ছাড়া কাউকে নজরেই পড়তো না। বিদেশীদের সংখ্যা ছিল গুটিকয়েক। বিগত ৩০-৪০ বছরে বিশ্বায়নের প্রভাবে যুগের হাওয়া বদলে গেছে। এখন সারা বিশ্বেই বিভিন্ন দেশের লোকদের আনাগোনা বেড়েছে এবং সেই সাথে বেড়েছে একাধারে বন্ধুত্ব ও বৈরিত্ব; সহনশীলতা ও অসহিষ্ণুতা; ভালোবাসা ও বিদ্বেষ; জাগতিক পছন্দ ও অপছন্দ; প্রেম ও ভালোবাসার বিভিন্ন রূপ; মানবিক চরিত্র মূল্যায়নের বিভিন্ন মাপকাঠি এবং আরো এরূপ বহু উৎপাদক যার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবের সামনে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি আর ভাবছি। বয়স হয়েছে তা টের পাই হাড়ে হাড়ে। মাত্র মাইল দেড়েক হেঁটেই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। ইচ্ছে হয় ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবের ছায়ায় সামনের সবুজ ঘাসের গালিচায় দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকি এবং চারদিকের চলমান দৃশ্য উপভোগ করি এবং সাথে বয়ে আনা পানীয় ও আহার্যের স্বাদ উপভোগ করি। কিন্তু তাত হওয়ার নয়। রিবাট শহর লন্ডন দেখতে হবে। কিন্তু কোত্থেকে দেখা শুরু করব? এটাই ভাবনা। তাই আমার আজকের কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য সেখানে বসেই সদ্য আহরিত তথ্যবাহক প্রচারলিপিকা, যা এখান থেকেই সংগ্রহ করেছি– তাই দেখতে থাকলাম। সুধী পাঠক, উপলব্ধি করুন ইংরেজরা পর্যটকদের নিবিড়ভাবে আকর্ষণের জন্য পথে-ঘাটে, বাস স্টেশনে, বিভিন্ন দোকানের কাউন্টারে, পেট্রল স্টেশনে, হোটেলের বাইরে-ভেতরে, রেস্তোরাঁতে, এমনকি পাবলিক টয়লেটের

www.pathagar.com

সামনেও পর্যটন প্রচার পুস্তিকা সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। এতে খরচা আছে কিন্তু মুনাফা আছে তার চেয়েও অনেক বেশি।

পর্যটক শিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্য সচিবালয়ে বসে নির্দেশ প্রদানের কৃষ্টি ছেড়ে দিয়ে বিদেশে কিভাবে এই শিল্পকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে তা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করতে হবে। সরকার দিয়ে এই কাজ সম্ভব নয়। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সর্বোতভাবে সাহায্য প্রদান করতে হবে। তবেই এই শিল্পে প্রবৃদ্ধি আসবে এবং আমাদের দেশও এই শিল্প থেকে প্রচুর আয় করতে পারবে।

www.pathagar.com

দুই.

লন্ডনের ইতিবৃত্ত

আহরিত লিফলেটের তথ্য থেকে দেখতে পাই যে রোমের রাজা ক্লডিয়াস ৪৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন শহরটি দখল করে নেয় এবং তাদের রসদ ও মালামাল আনা-নেয়ার সুবিধার্থে তারা টেমস নদীর মোহনায় একটা গভীর সমুদ্রগামী পোতাশ্রয় তৈরি করে। সেই থেকেই লন্ডন শহরের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমানরা এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রাখে এবং তাদের নির্মিত লন্ডনিয়াম শহরের চারদিকে প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করে দুর্ভেদ্য করে তোলে। লন্ডনিয়ামই পরে লন্ডন হয় এবং এটাই লন্ডনের গোড়ার কথা।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই উত্তর ইউরোপ থেকে নানা জাতি উপজাতি ইংল্যান্ডের উপকূলে হানা দিতে থাকে। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ৪১০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যায়। তারপর দফায় দফায় এল জার্মানি, ডেনমার্ক ও হল্যান্ড থেকে স্যাক্সনরা এবং তারাও দীর্ঘ ৪০০ বছর ধরে ইংল্যান্ডের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে রাখে। ইতিহাস থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের ভাইকিংরা লন্ডন দখল করে নেয় এবং লন্ডনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ইংল্যান্ডের স্যাক্সন রাজা আলফ্রেড দ্য গ্রেট ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভাইকিংদের বিতাড়িত করেন, রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং লন্ডন শহর নতুন করে নির্মাণ করে একে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। দুর্ধর্ষ ভাইকিংরা সুযোগ পেলেই লুটপাটের উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ দখল করত এবং সেই সুবাদে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভাইকিংরা পুনরায় লন্ডন দখল করে নেয়। পরবর্তী ৫০ বছর অরাজকতার মধ্য দিয়ে কাটে।

ইংল্যান্ডের ইতিহাস শুরু হয় রাজা এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর থেকে। রাজা

www.pathagar.com

ক্যানিউটের রাজত্বকালে এডওয়ার্ডের পিতা এথেলরেড এবং মা এমা ইংল্যান্ড থেকে পালিয়ে নরমান্ডিতে চলে যান। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্যানিউটের মৃত্যুর পর তার পুত্র ও বিশ্বস্ত সামন্ত আর্ল গডউইনের সাহায্যে এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা এডওয়ার্ডই ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে নির্মাণ করে এখানে কনফেশনের ব্যবস্থা করে যান। এ থেকেই রাজার নাম হয়েছিল এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর। তিনি ২৩ বছর রাজত্ব করার পর ১০৬৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি সিংহাসনের জন্য ৩ জন দাবিদার রেখে যান।

প্রথম দাবিদার হলেন রাজা ক্যানিউটের পুত্র হ্যারল্ড গোল্ড উইনসন। এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর ছিলেন হ্যারল্ড গোল্ড উইলসনের ভগ্নিপতি। সেই সূত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। মৃত্যুকালে তিনি রাজ্যের ভার তার কাছেই ন্যস্ত করে যান। অন্যান্য সভাসদও হ্যারল্ড গোল্ড উইনসনকে রাজা মেনে নেন এবং এডওয়ার্ড দ্য কনফেসরের মৃত্যুর দিনই তার রাজ্যাভিষেক হয়।

সিংহাসনের দ্বিতীয় দাবিদার ছিলেন ডিউক অব নরমান্ডির উইলিয়াম। তার বক্তব্য ছিল যে ১০৬৪ সালে এক পত্র মারফত এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর তাঁকে জানান যে এডওয়ার্ড দ্য কনফেসরের মৃত্যুর পর উইলিয়ম সিংহাসনে আরোহণ করবেন এবং সেই পত্রটি হ্যারল্ড গোল্ড উইনসনই নিজে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উইলিয়ামের সুস্পষ্ট মন্তব্য ছিল যে হ্যারল্ড গোল্ড উইনসন জেনে শুনে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুতরাং স্বেচ্ছায় সিংহাসন না ছাড়লে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে।

তৃতীয় দাবিদার হচ্ছে নরওয়ের রাজা হারদ্রাদা। তার কথা ছিল যে ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি বলে ইংল্যান্ডের রাজ্যভার হয় ডেনদের কাছে নয় নরম্যানদের কাছে ন্যস্ত করা হবে। যেহেতু হ্যারল্ড একতরফাভাবে রাজ্য গ্রাস করেছে তাই তিনি ভাইকিং সৈন্য নিয়ে ইংল্যান্ডের উত্তর উপকূলে আক্রমণ চালালেন। রাজা হ্যারল্ড সে আক্রমণ প্রতিহত করলেন। যুদ্ধে হারদ্রাদার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো এবং হারদ্রাদা নিজেও মৃত্যুবরণ করলেন।

একই সময়ে ১০৬৬ সালে হেস্টিংসের কাছে উইলিয়ামও আক্রমণ করে বসলেন। হ্যারল্ড সে আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। নরমান রাজা প্রথম উইলিয়াম রাজা হ্যারল্ডকে হেস্টিংসের যুদ্ধে পরাজিত করে, উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার নাম ধারণ করে ১০৬৬ সালে খ্রিস্টমাসের দিনে ওয়েস্ট মিনস্টার

www.pathagar.com

অ্যাবেতে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে অরোহণ করলেন। ১০৬৬ সালটা তাই ইংল্যান্ডের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সুধী পাঠক, ইতিহাসের কচকচানিতে হয়তোবা আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এডওয়ার্ড দ্য কনফেসরের উল্লেখ এবং উইলিয়াম দ্য কঙ্কারারের অবস্থান না জানিয়ে বিদায় নিলে আমার লেখনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই আমার মনে হয়েছিল। তাই সংক্ষেপে ইতিহাস তুলে ধরলাম। ইতিহাস থেকে একটা মূল্যবান তথ্য অবশ্যই সংগ্রহ করা যায় যে ব্রিটিশরা কোনোকালেই ভূমিপুত্র দিয়ে শাসিত হয়নি। রোমানরা শাসন করেছে ৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারপর একের পর এক করে ভাইকিং, স্যাক্সন রাজা আলফ্রেড দ্য গ্রেট, পুনরায় ভাইকিং এবং শেষে নরমান রাজাদের মাধ্যমে শাসিত হয়েছিল।

রাজরাজড়াদের কাহিনীতেই ভর্তি ইংল্যান্ডের ইতিহাস। তাই আমার পদযাত্রা পথে রাজা রানীদের কীর্তির ফিরিস্তি দিয়েই অগ্রসর হব। এখন আমরা ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবেকে পেছনে রেখে ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজের দিকেই এগোই।

ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজটি ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। টেমস নদীর ওপর সমদূরত্বে স্থাপিত ৬টি ফাউন্ডেশন স্তম্ভের ওপর ৭টি স্প্যানের মাধ্যমে এই টেমস পারাপার সংযোগ সেতুটি নির্মাণ করা হয়। লন্ডন নগরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্বমোট ১০-১২ মাইলের মধ্যে টেমস নদীর এপার ওপার যোগাযোগের জন্য ১৫টি সেতু রয়েছে। এই সেতুটি হচ্ছে দ্বিতীয় সেতু। লন্ডন ব্রিজ হচ্ছে সর্বপ্রথম সেতু যা ১১৭৬ থেকে ১২০৯ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। টেমস নদীটি লন্ডনের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে লন্ডনকে উত্তর-দক্ষিণ দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে। এই শহরটির বর্তমান আয়তন ১৫৭২ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লাখ।

ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে থেকে আমরা পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে বেরুলাম। আমাদের ডান দিকে ডিনস ইয়ার্ডে দেখলাম কুইন্স এলিজাবেথ কনফারেন্স সেন্টার। তারই কোনায় অবস্থিত বিরাট মেথোডিস্ট চার্চ হল। এবারে আমরা ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের দিকে অগ্রসর হলাম এবং ব্রিজ পার হওয়া শুরু করলাম। ব্রিজের দু ধারেই প্রশস্ত ফুটপাথ এবং অসংখ্য লোক উভয় ধারের ফুটপাথ দিয়ে চলছে। দেখলাম ফুটপাথে অনেক দোকানি তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। অনেকটা আমাদের দেশের মতো। কোনো কোনো দোকান আছে যেখানে হরেক দ্রব্যই দো দো পাউন্ড মূল্যে পাওয়া যায়। এগুলো স্যুভেনির জাতীয় দ্রব্যাদি। আমি

www.pathagar.com

একটা দোকান থেকে লন্ডনের ৭টা পোস্টকার্ড ছবি কিনলাম স্মৃতিস্মারক হিসেবে।

পুলের ওপর থেকেই দেখা যায় লন্ডনের 'বিগ হুইল' অথবা 'লন্ডন আই'। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ এবং টুস্যা গ্রুপের অর্থানুকূল্যে এই বৃহৎ লৌহনির্মিত চাকাটি তিন বছর আগে একবিংশ শতকের আগমনী উপলক্ষে টেমস নদীর দক্ষিণ তীরে জুবিলি গ্রাউন্ডে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিশ্বে এটাই সর্ববৃহৎ চাকা। এই হুইলের ব্যাস হচ্ছে ৪৫০ ফিট এবং ওজন হচ্ছে ১৬০০ টন। লৌহনির্মিত এই হুইলটি একটা স্ট্রাকচারের ওপর স্থাপন করা হয়েছে সমগ্র লন্ডনকে একনজরে দেখার সুবিধার জন্য। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একদম স্থির কিন্তু আসলে এটা একটু একটু করে ঘুরছে এবং প্রত্যেক আধা ঘণ্টায় এটা একবার ঘুরে আসে। এর পরিধিতে কিছু দূর পরপরই একটা করে ঝুলন্ত তাপনিয়ন্ত্রিত বগি আছে যাকে বলা হয় ক্যাপসিউল এবং তাতে ২৫ জন যাত্রী এক সাথে বসতে পারে। সর্বমোট

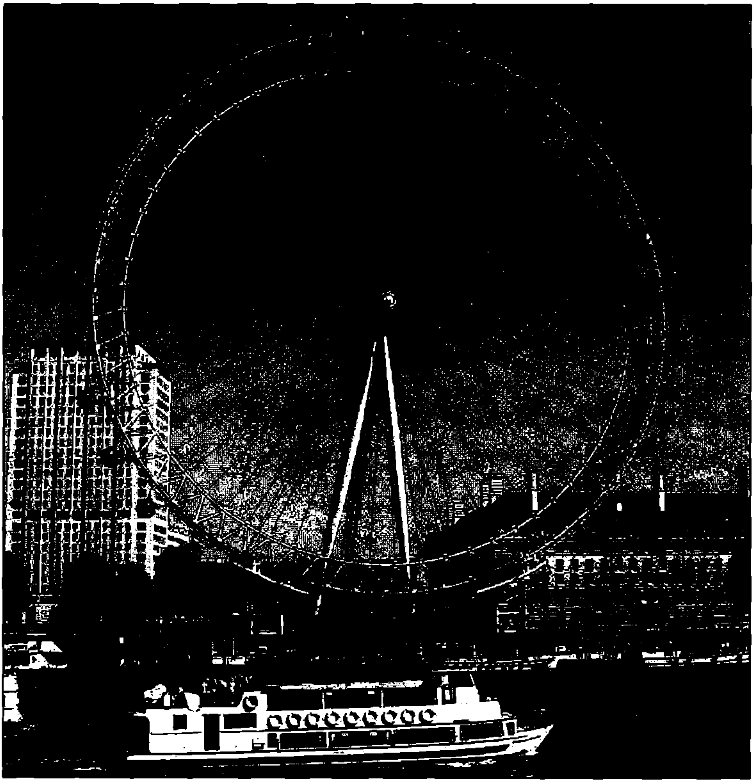

লন্ডন আই

www.pathagar.com

৩২টি ক্যাপসিউল এই বৃহৎ চাকার পরিধিতে সংযুক্ত আছে। ধীরে ধীরে চাকা ঘুরতে থাকে এবং বগিগুলোও ঝুলন্ত অবস্থায় চাকার ঘূর্ণনের সাথে চলতে থাকে। ২০০০ সাল উদযাপন উপলক্ষে এই হুইলটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই এটাকে মিলেনিয়াম হুইলও বলা হয়ে থাকে এবং এই পিয়ার অর্থাৎ জেটিকেও মিলেনিয়াম পিয়ার হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

এই চাকাটির উদ্ভাবক হচ্ছেন ডেভিড মার্ক ও জুলিয়া বারফিল্ড নামে এক আরকিটেক্ট দম্পতি। তারা সমগ্র লন্ডনকে একনজরে দেখার জন্যই এই বৃহৎ চাকাটি নির্মাণ করেন। এরই জন্য এটাকে 'লন্ডন আই' অর্থাৎ লন্ডনের চোখও বলা হয়ে থাকে। এই হুইলে প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০ যাত্রী এক চক্কর দিয়ে আসতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এত বড় কাজ সম্পন্ন করা মুশকিল হচ্ছিল বিধায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ও তুসা গ্রুপ এই উদ্যোগকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে বলে এই হুইল নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে আসে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য এক চক্কর দেয়ার জন্য জন প্রতি ফি নির্ধারণ করেছে ১২.৫ পাউন্ড। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ একটি বাণিজ্যিক সংস্থা, তাই তারা নিজস্ব প্রচারণার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু তুসা গ্রুপ সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেয়া প্রয়োজন। পাঠকের মধ্যে অনেকেই হয়তো ম্যাডাম তুসার মোমের মিউজিয়াম দেখে থাকতে পারেন অথবা নাম শুনেছেন। Tussauds Groupটি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী দর্শনার্থীদের আকর্ষণের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করার একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রজেক্টে বিনিয়োগ করাকেও তুসা গ্রুপ লাভজনক মনে করেছে বলেই এখানে টাকা ঢেলেছে।

ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের শেষ প্রান্তে এসে অদূরেই ডান দিকে নদীর তীরে এলবার্ট এমব্যাংকমেন্টে দেখতে পেলাম লন্ডনের বিখ্যাত সেন্ট টমাস হাসপাতাল। বাম দিকে ২০০ গজ দূরেই দেখতে পেলাম লন্ডন আই অতি ধীর গতিতে ঘুরে চলেছে।

আমার পরবর্তী গন্তব্য স্থান হচ্ছে টেইট গ্যালারি কিন্তু ওটা যে কোথায় তা ঠিক জানি না। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলে নদীর উল্টো পারে। আমার হাতে যে ম্যাপ রয়েছে, সেখানে দেখতে পাচ্ছি এপারেই টেইট গ্যালারি। তাই বিভ্রান্তিতে পড়লাম আবার কি অপর পারে যাব? ম্যাপ ভুল হতে পারে না। এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতেই দেখতে পেলাম যে টেমস নদীতে নৌবিহারের স্টেশন। দেখলাম নৌবিহারের জন্য লাইন ধরেছে অনেক লোক। প্রাক্তন নাবিক,

www.pathagar.com

নদী, পানি এবং অপেক্ষমাণ লাক্সারি বোট দেখে কি নিশ্চুপ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই নৌবিহারটা আনন্দদায়ক হবে এই ধারণা নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং টাওয়ার অব লন্ডনের একটি ফেরত টিকিট কিনে নিলাম। ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ থেকে টাওয়ার অব লন্ডন নদী পথে খুব বেশি হলে মাইল পাঁচেক হবে। রিটার্ন টিকিটের মাশুল হলো সাড়ে চার পাউন্ড– আমাদের টাকায় সাড়ে চার শ টাকা।

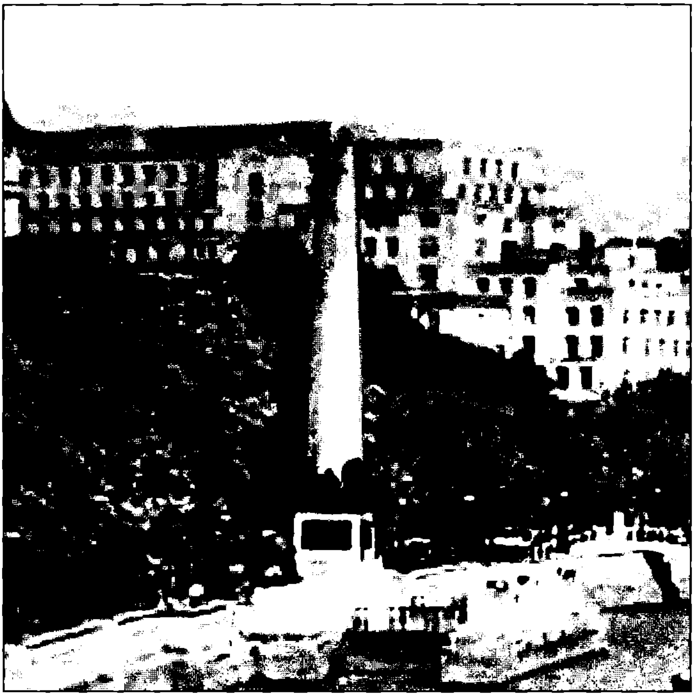

ক্লিওপেট্রা নিড্‌ল্

আমাদের নৌভ্রমণ শুরু হলো। ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের পর বাম দিকে প্রথমেই রয়েল এয়ারফোর্সের প্রতীক সোনালি ঈগল পাখির মূর্তি তৈরি করে রাখা আছে। তারপরই হ্যাঙ্গারফোর্ড ব্রিজের কাছে ক্লিওপেট্রার নিড্‌ল্। এই সংস্থিতিটা মিসরের ভাইসরয় মোহাম্মদ আলী ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মিসর থেকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে নৌযুদ্ধে সম্রাট নেপোলিয়নকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন লর্ড নেলসন– সেই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভটি ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্টে স্থাপন করা হয়েছিল। নাম

www.pathagar.com

ক্লিওপেট্রার নিড্‌ল্ হলেও এর সাথে মিসরের বিশ্বসুন্দরী রাজমহিষী ক্লিওপেট্রার খুব কমই সম্বন্ধ আছে। নিড্‌ল্‌টির ইতিহাস হচ্ছে আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে মিসরের ফারাও তৃতীয় টট্‌মাস এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং

এটাকে মিসরের হেলিওপলিস শহরে স্থাপন করেছিলেন। নির্জনে অবহেলিত অবস্থায় এই সুঁচ আকৃতির ৪৮ ফিট উঁচু এবং ১৮০ টন ওজনের লাল গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভটি পড়ে থাকে দীর্ঘ ১৫০০ বছর।

গ্রিক সম্রাট সিজার অগাস্টাসের সময় খ্রিস্টপূর্ব ১২ সালে এই ঐতিহাসিক স্তম্ভটিকে সুন্দরী ক্লিওপেট্রার রাজকীয় শহর আলেকজান্দ্রিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। গ্রিক সম্রাট সিজার অগাস্টাস ক্লিওপেট্রার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন এবং বিবাহ করে রোমে নিয়ে যান। তারপর কী হলো? অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিচরণ করব? না ক্লিওপেট্রার নিড্‌লের কেচ্ছায় ফিরে যাব? সুধী পাঠক নিশ্চয়ই ক্লিওপেট্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী ডিঙ্গিয়ে নিড্‌ল্‌টিতে চলে যেতে চাইবেন না। এটা আমার অনুভূতি এবং আগেই বলেছি যে আমি আমার পাঠকদের সাথে নিয়েই ভ্রমণ করাটা পছন্দ করি। তাই ক্লিওপেট্রার রোমাঞ্চকর জীবনের কিছু অংশের চিত্রপটে যেতে যেতেই বলে যাই।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৯ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে ক্লিওপেট্রা জন্ম। রাজা টলেমি অলিটিস তার ১৮ বছর বয়সী সুন্দরী কন্যা ক্লিওপেট্রাকে রাজ্যভার দিয়ে যান। সেই যুগে মিসরীয় রীতি অনুযায়ী অনূঢ়া কন্যাকে সম্রাজ্ঞী হওয়ার জন্য অবশ্যই স্বামী থাকতে হতো। স্বামী না থাকলে ছোট ভাই এ অধিকার পেত। এই রীতি অনুযায়ী ১২ বছর বয়সের ছোট ভাই ত্রয়োদশ টলেমির সাথে ক্লিওপেট্রার বিয়ে হয়। ক্লিওপেট্রা ক্ষমতার লোভে এই রীতি মেনে বিয়ে করেন বটে কিন্তু স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করতে থাকেন।

ক্লিওপেট্রা যখন সম্রাজ্ঞী হন তখন রোমানরা তার সাম্রাজ্য গ্রাস করে নিতে থাকে। সাইপ্রাস, সিরিয়া, সিরেনাইকা হস্তচ্যুত হয়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ সালে সিজার আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়। রাজ্য রক্ষার জন্যই এই সময় ক্লিওপেট্রা সম্রাট সিজারের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে ভালোবাসার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। সিজার ত্রয়োদশ টলেমিকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। টলেমি পালিয়ে যাওয়ার সময় নৌকোডুবিতে প্রাণ হারান। এদিকে সিজার ও ক্লিওপেট্রার প্রণয় আরো গভীর হয়। কিন্তু রাজ্যের বিধান অনুযায়ী সম্রাজ্ঞী থাকতে হলে তাকে রাজবংশীয় কাউকে বিয়ে করতে হবে। ক্লিওপেট্রা তখন সর্বকনিষ্ঠ ১১ বছর বয়স্ক

www.pathagar.com

ভাই চতুর্দশ টলেমিকে বিবাহ করেন। সিজার ও ক্লিওপেট্রার প্রণয় চলতে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ সালে তাদের এক পুত্র জন্মে এবং তাকে নাম দেয়া হয় টলেমি সিজার। তার এক বছর পরই খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ সালে সিজার স্ত্রী ও পুত্রসহ রোমে চলে যান। সিজার তার পুত্রকে স্বীয় পুত্র বলে পরিচয় দিতে থাকেন এবং ক্লিওপেট্রাকে নিজ গৃহে স্থান দেন। রোমানরা এই ব্যবহারকে অনাচার বলে আখ্যায়িত করে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে সিজার গুপ্তহত্যার শিকার হন। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই সিনেটররা এই হত্যা করান।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্লিওপেট্রা পুত্রসহ পালিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে আসেন। ফেরত এসে ক্লিওপেট্রা তার স্বামী চতুর্দশ টলেমিকে হত্যা করান এবং ৪ বছর বয়স্ক নিজ পুত্র টলেমি সিজারকে কো-রিজেন্ট হিসেবে বহাল করে রাজত্ব করতে থাকেন। মিসরে তখন অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে সিজারের মৃত্যুর পর রোমের অবস্থাও তথৈবচ। এ সময়ে ক্লিওপেট্রা মার্ক অ্যান্টনি নামে রাজবংশীয় এক রোমান নায়কের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী দু বছর প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে একসাথে বসবাস করতে থাকেন। এই সময় এন্টনির ঔরসজাত ক্লিওপেট্রার যমজ এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

এন্টনিকে রোমে যেতে হয় বিশেষ করে তার বিবাহিতা স্ত্রী অক্টাভিয়ার সাথে বোঝাপড়া করার জন্য। কিছু দিন পর এন্টনি ফিরে আসেন এবং এসেই সাইপ্রাস সিসিলীয় উপকূল, ফনিসিয়া এবং তার সাম্রাজ্যের আরো কিছু অংশ ক্লিওপেট্রা এবং তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করে দেন এবং তাদের রাজা-রানীর খেতাব প্রদান করেন। ক্লিওপেট্রাকে সম্রাজ্ঞীর উপাধিতে ভূষিত করেন। তা ছাড়া তিনি তার প্রথম স্ত্রী অক্টাভিয়াকে তালাক দেন। এতে রোম মার্ক এন্টনির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এন্টনির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ সনে এন্টনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। শাস্তি হিসেবে অক্টাভিয়া ক্লিওপেট্রাকে আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তায় সাধারণ দাসী হিসেবে কাজ করার আদেশ জারি করেন। দাম্ভিক ক্লিওপেট্রা এই সব আদেশকে তুচ্ছ মনে করে তার পালিত কোবরা সর্পের দংশনে মৃত্যুবরণ করেন। সে দিনটি ছিল ১২ আগস্ট খ্রিস্টপূর্ব ৩০ সাল।

ফেরত আসি নিড্লটির কাহিনীতে। সিজার অগাস্টাস এই নিডলটি আলেকজান্দ্রিয়ায় আনান সম্ভবত ক্লিওপেট্রার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। ক্লিওপেট্রা, সিজার অগাস্টাস এবং মার্ক এনটনিদের নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু

www.pathagar.com

পাথরে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি বহু শতাব্দী আলেকজান্দ্রিয়ার বালির ঢিবিতে মুখ থুবরে পড়ে থাকার পর আজও বহাল তবিয়তে আছে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মিসরের ভাইসরয় মোহাম্মদ আলি এই স্মৃতি স্তম্ভটি লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। ব্রিটিশ নৌ সেনাপতি নেলসনের সম্রাট নেপোলিয়নের ওপর বিজয়ের স্মৃতিকে ভাস্বর রাখার উদ্দেশ্যে এটাকে ভিক্টরিয়া এমব্যাংকমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তিন.

টেমস নদীতে নৌবিহার

নদীতে কিছুক্ষণ বিচরণ করতে পারব এই আনন্দ নাবিক মনকে দোলা দিয়েছিল বলেই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই টিকিট কেটে জাহাজে উঠেছি। বহু দিন পর জাহাজে উঠেছি তাই মনটা উৎফুল্ল। এই জাহাজটি হলো ক্যাটামেরিন টাইপ অর্থাৎ দুটি খোলের ওপর একটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করে তার ওপর জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে। জাহাজে শতাধিক যাত্রী এদিক-সেদিক বিচরণ করছে। সুসজ্জিত জাহাজ এবং এতে যাত্রীদের জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। জাহাজের অভ্যন্তরীণ প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ভাষ্যকার যাত্রাপথে উভয় তীরের বর্ণনা দিয়ে চলেছে। সোনালি ঈগল এবং ক্লিওপেট্রা নিড্লের বিবরণ আমি আগেই দিয়ে এসেছি। বর্তমানে তাই ক্লিওপেট্রা নিড্লের পর থেকে যা কিছু নজরে আসবে তার বিবরণ দিতে থাকব।

নৌপথে এবারে দেখলাম ডান তীরে টেইট গ্যালারি এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়রের থিয়েটার। এই টেইট গ্যালারির খোঁজই আমি করছিলাম কিন্তু কোথায় এটা অবস্থিত তার হদিস তখন পাইনি। সম্প্রতি এটা নির্মাণ করা হয়েছে বলেই বহু লন্ডনবাসী এর সঠিক অবস্থান জানে না। লন্ডনের ইংরেজ পথচারীরা যখন আমাকে উত্তর তীরের টেইট গ্যালারির কথা বলছিল তাও সঠিক ছিল, কেননা মূল টেইট গ্যালারি ওখানেই অবস্থিত। যা-ই হোক, মডার্ন টেইট গ্যালারির ঠিকানা যখন পেলাম তখন একদিন এসে দেখে যাব।

জাহাজ চলছে। ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের উত্তর দিকে নদী যেখানে বাঁক নিয়ে পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে সেখানেই ওয়াটারলু ব্রিজ। ওয়েস্ট মিনস্টার থেকে ৪০০-

www.pathagar.com

৫০০ মিটার দূরে হবে। এই ব্রিজটি ১৮১৭ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। ওয়াটারলু যুদ্ধে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লর্ড নেলসনের বিজয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই ব্রিজটি উদ্বোধন করা হয়। আমরা যখন এই ব্রিজটির নিচ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনই শুনলাম যে এরপর আমাদের পথে পড়বে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রিজ, সাউথওয়ার্ক ব্রিজ, লন্ডন ব্রিজ এবং সর্বশেষে টাওয়ার ব্রিজ। টাওয়ার ব্রিজ আমাদের পার হতে হবে না । তার আগেই আমরা অবতরণ করব।

লন্ডন ব্রিজ

নদীর দক্ষিণ তীরে রয়েল ফেস্টিভাল হল, কুইন এলিজাবেথ হল, ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার এবং লন্ডন টেলিভিশন সেন্টার দেখলাম। এসবই দক্ষিণ তীর ধরে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স সেতুর দিকে যাওয়ার পথেই পড়ে।। ওয়াটারলু সেতু থেকে আরো প্রায় আধা মাইল পূর্বে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রিজ। ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রিজটির আগের নাম ছিল সেন্ট পল ব্রিজ এবং এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। একটু পরই পায়ে হাঁটা মিলেনিয়াম ব্রিজটি এখানে নদী অতিক্রম করেছে। একবিংশ শতাব্দীর আগমন উপলক্ষে এই ব্রিজটি তৈরি করা হয়। এরই নিকট টেমস নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত শেক্সপিয়র গ্লোব থিয়েটার এবং একজিবিশন হল। মডার্ন টেইট গ্যালারিও এখানেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, টেইট গ্যালারি ওয়েস্ট মিনিস্টার

www.pathagar.com

ব্রিজের গোড়া থেকে মাইল খানেক দূরে অবস্থিত। এই গ্যালারিটির খোঁজই আমি করছিলাম এবং তখন না পেয়ে এই নৌবিহারটি বেছে নিয়েছিলাম।

জাহাজ এগিয়ে চলল। ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রিজ থেকে আরো আধা মাইল পূর্ব দিকে সাউথওয়াক ব্রিজ। ৭০৮ ফিট লম্বা এই সেতুটি ১৭৬৮ সনে নির্মাণ করা হয়। এই ব্রিজের পর থেকে নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে। উত্তর তীরে আকলো সেন্ট পল ও লিভার ব্রাদারস্। এই ব্রিজ থেকে সিকি মাইল দূরেই হচ্ছে লন্ডন ব্রিজ। লন্ডন ব্রিজটিই এই অঞ্চলে প্রাচীন এবং এর ইতিহাসও বৈচিত্র্যময়। যুগে যুগে এই ব্রিজটি বিভিন্ন দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছে। কখনো প্লাবনে বিনষ্ট হয়েছে কখনো বা মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডে নিপতিত হয়েছে এবং নতুন করে বারবার এটাকে মেরামত ও নির্মাণ করতে হয়েছে। এরই জন্য নার্সারি রাইম Nursery Rhyme– London Bridge is Falling down-এর সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে আমি বিভিন্ন ব্রিজের প্রতিটি কত লম্বা তার ধারণা দিচ্ছি।

ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ	১২২৩	ফিট
ওয়াটারলু ব্রিজ........................	১২৪২	ফিট
ব্ল্যাকফ্রায়ার্স ব্রিজ.....................	৯৪০	ফিট
সাউথওয়ার্ক ব্রিজ......................	৭০৮	ফিট
লন্ডন ব্রিজ............................	৯০০	ফিট

লন্ডন ব্রিজের প্রথম আবির্ভাব হচ্ছে ৪৬ খ্রিস্টাব্দে। রোমানরা তৈরি করেছিল। কাষ্ঠনির্মিত এই ব্রিজ পারাপারের একমাত্র মাধ্যমে ছিল। রোমানদের চলে যাওয়ার পর ভাইকিংদের এবং অন্যান্য আক্রমণ এই ব্রিজ কখনো বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা হয় কখনো বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। নদীপথকে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত রাখার জন্যই এসব পদক্ষেপ নেয়া হতো। আক্রমণকারীরা চলে গেলেই আবার এই সেতু মেরামত করে নেয়া হতো এবং নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা হতো। কিছু দিন পর আবার আক্রমণকারীরা আসত এবং নদীপথ উন্মুক্ত করার জন্য ব্রিজটি ভেঙে দিত। এভাবেই বহু শতাব্দী লন্ডন ব্রিজটি ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই চলতে থাকে। এসব কারণেই লন্ডন ব্রিজের ওপর ওই নার্সারি রাইমের সৃষ্টি হয়েছে।

লন্ডন ব্রিজ পর্যন্ত নদী পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার পরই দক্ষিণের দিকে একটু মোড় নিয়েছে এবং বাঁকের শুরুতেই ইতিহাস বিখ্যাত টাওয়ার ব্রিজটি অবস্থিত।

টেমস নদীটি লম্বায় মাত্র ২১৫ মাইল এবং এতে স্বাভাবিক জোয়ার-ভাটাই হয় এবং মোটামুটি খরস্রোতা নদীই বলা যেতে পারে। লন্ডনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

www.pathagar.com

হচ্ছে এবং লন্ডনকে উত্তর-দক্ষিণে দ্বিখণ্ডিত করেছে। দেখলে বেশ সুশীল একটি নদী মনে হয়। উভয় তীরই সুন্দরভাবে রক্ষিত। কোথাও নদীভাঙনের কোনো নিশানা নেই। মনে হয় যেন এই নদী কখনো অসামাজিক কাজ করে না, কারো কোনো ক্ষতি করে না, সর্বদা নিজ মনে নিজের গতিপথে চলে। এই নদীটি মনে হয় সকলের সুবিধার জন্য নিজেকে অবাধে লন্ডনের বুকে বিছিয়ে রেখেছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, এই নদী হাজার বছর ধরে লন্ডনকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং লন্ডনের কোথাও ছোবল মেরে কূল ভেঙে দিচ্ছে না। কখনো ক্রুদ্ধ হচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণরূপে একটা পোষা নদী।

একদিকে এটা যেমন ঠিক, অন্য দিকে এটাও ভাবতে হবে যে, লন্ডনবাসী তাদের এই প্রিয় নদীটিকে সম্পূর্ণভাবে সুন্দর রাখার জন্য কতটা পরিচর্যা করে যাচ্ছে। এই নদীর পানিকে যেকোনো প্রকার অপবিত্রতার হাত থেকে রক্ষার জন্য লন্ডনের সমগ্র প্রশাসন ব্যস্ত থাকে। বিগত ৫০ বছরে এর নাব্যতা শুধু উন্নত হয়নি এর পানির বিশুদ্ধতাও বেড়েছে অনেক গুণ। যুগের সাথে সাথে নদীর তীরে অনেক প্রকার শিল্প গড়ে উঠেছে এবং তা থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য নিষ্কাশন করতে হচ্ছে। এই বর্জ্য তরলই হোক কিংবা কঠিন হোক, প্রথমে তা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত না করে নদীতে ফেলা মানা। যেসব পদার্থ Bio degradable নয় অর্থাৎ পচনশীল নয়, সেসব পদার্থ নদীতে ফেলা যাবে না। কাচের টুকরো, শিশি বোতল, মোড়ক পলিথিন ইত্যাদি ফেলা সম্পূর্ণ মানা।

এ বিষয়ে সিটি অব লন্ডনের অনেক আইন আছে এবং পূর্ণ বাস্তবায়নের পরই বর্জ্য নদীতে ফেলা যেতে পারে। সিটি অব লন্ডনের বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যাপারে বহুবিধ আইনের মধ্যে রয়েছে যে, শহরের কোনো বর্জ্য পানিতে ফেলার আগে তা ব্যাকটেরিয়ামুক্ত করতে হবে। পানিকে নিউট্রাল অর্থাৎ এটা অ্যাসিড কিংবা অ্যালকেলাইন মুক্ত করতে হবে। একটু তরল ও ঘন পদার্থের মিশ্রণের ঘনত্ব একটা সীমারেখার বেশি হবে না। এই তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণকে sludge বলা হয়। ঘন স্লাজ নদীর নিচে জমা হয়ে নাব্যতা নষ্ট করে। ঘন কর্দমাক্ত পদার্থ থেকে আঠা ও আঁশযুক্ত পদার্থগুলোকে বের করে নিয়ে অপেক্ষাকৃত মানসম্মত তরল পদার্থ নদীতে ফেলা যেতে পারে।

পথ চলতে গেলেই অনেক কিছু নজরে আসে, সেগুলোও মনে দাগ কাটে। তারই ছোট একটা ঘটনা বর্ণনা করছি। ক্যাটামেরান জাহাজটি যখন চলছিল তখন টেমস নদীর ফুরফুরে বাতাসও বইছিল। ৮-৯ বছরের একটি ছেলে এবং একটি

www.pathagar.com

মেয়ে কিটক্যাট কিংবা চকলেট জাতীয় কিছু খাচ্ছিল এবং মোড়কগুলো দলা করে পানিতে ছুড়ে মারছিল। ব্যাপারটা তাদের মায়ের নজরে আসে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এসে ভর্ৎসনা করে গেলেন এই বলে যে, তোমরা এটা কী করলে? নদীতে এভাবে কিছু ফেলা উচিত নয়। তারা দেশকে এবং তাদের সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করার জন্য কতটা সচেতন, তা বোঝানোর জন্যই এই ছোট গল্পটির অবতারণা করলাম। আমার লেখা 'সুইডেন শান্তির দেশ' বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৫ এবং ১৬ পৃষ্ঠায় এ ধরনের আর একটি উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম। আমরাও যদি আমাদের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা কর্ণফুলী ও রূপসা নদীগুলোকে সচেতনভাবে এতটা আদর-যত্ন করতাম তাহলে আমাদের নদীসমূহও নিঃসন্দেহে আমাদের সেবা করে যেত।

'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা' এই তথ্যটিই আমরা কাব্য কাহিনী থেকে জেনেছি। প্রকৃতি নদীকে নিয়ে যেভাবে খুশি খেলবে, এটাই আমরা মেনে নিয়েছি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে দু কূলই যে রক্ষা করা যায় তার ইতিবৃত্ত আমাদের অজানাই রয়ে গেছে। আমাদের খুশিমতো নদীকে চালাতে হলে নদীকে ট্রেনিং দিয়ে পোষ মানাতে হবে। ট্রেনিং দিয়ে তাকে সঠিক পথে প্রবাহিত হওয়ার ধারা শেখাতে হবে। ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের দেশের প্রায় সকল নদীকেই নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালনা করছে এবং সেই সাথে নাব্যতাও রক্ষা করে চলেছে। তারা হিসেব করে বের করে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করতে হলে নদীটি কতটা প্রশস্ত হতে হবে এবং কতটা গভীর হতে হবে।। অঙ্কের হিসাব মিলিয়ে তারা নদীটির Cross section বের করে এবং তারপর নাব্যতা রক্ষার জন্য স্রোতের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে নদীর অবয়ব নিরূপণ করে উভয় তীর কংক্রিট দিয়ে বাঁধাই করে দেয় যাতে কূল না ভাঙতে পারে। প্রত্যেকটি নদীর বাঁকেই কিন্তু স্রোত যেয়ে আঘাত হানে এবং যে স্থানে আঘাত হানে সে স্থানটি যদি নরম হয় তাহলে অবশ্যই পাড় ভাঙবে। স্রোত যাতে সরাসরি আঘাত হানতে না পারে সে জন্য নদীর স্রোত ধারাকে আগে থেকেই বিকল্প ধারায় পরিচালনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। স্রোতকে তির্যকভাবে ধাবিত অথবা প্রবাহিত করে আঘাতের উগ্রতা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয। স্রোতের প্রবল ধাক্কা তখন সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে। এভাবেই ইউরোপের বড় বড় শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোকে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়ে রাখা হয়েছে। সীন নদীর তীরে অবস্থিত প্যারিস, রাইন নদীর তীরে অবস্থিত বন ও কলোন শহরগুলোবিগত শত বর্ষ ধরে একই স্থানে একইভাবে বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

তাই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতিকে সহমর্মিতা দিয়ে লালন করলে প্রকৃতিও মানুষের উৎকৃষ্ট বন্ধু হতে পারে। এরা নদীটিকে ভালোবাসে এবং নদীটি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাই তাদের নদীও ভালো থাকে এবং সেবাও দেয় অফুরন্ত।

এভাবেই চলতে চলতে একসময় আমরা টাওয়ার ব্রিজের নিকট পৌঁছে গেলাম। টাওয়ার ব্রিজের উত্তর পাড়ে বিখ্যাত টাওয়ার অব লন্ডন। এখানে আমাদের যাত্রার শেষ প্রান্ত। যদিও আমার রিটার্ন টিকিট ছিল তবু আমি এখানেই নেমে গেলাম। নদীপথে আবার ফেরত যাওয়ার কোনো মানে হয় না তাই পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখার মানসে তীরে উঠলাম।

সামনেই অবতরণ জেটির পূর্ব পাশে দেখতে পেলাম বিখ্যাত Tower of London. এখানেই ছিল আদি রোমান দুর্গ। এই দুর্গের মধ্যকার অনেক সংস্থিতি উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। আমি আজ হাঁটতে চাচ্ছি তাই টাওয়ার অব লন্ডনে গেলাম না। টাওয়ার অব লন্ডন পূর্ণভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। তখন আমার মরহুমা স্ত্রীও আমার সাথে ছিলেন। পরে কখনো যদি সময় ও সুযোগ পাই তাহলে টাওয়ার অব লন্ডন সম্বন্ধে লিখব।

আজ ওদিকে না যেয়ে টাওয়ার ব্রিজ ডান দিকে রেখে আমি উত্তর দিকে যেয়ে Bayward Street হয়ে চার্চ স্ট্রিটে পড়লাম। সেখান থেকে হেঁটে ফ্রেনচার্চ স্ট্রিট হয়ে অলগেট হাই স্ট্রিট পৌঁছলাম। বেলা তখন ৩টা। বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে গরমে। আজ রোদও উঠেছে বেশ। পাতাল রেল দিয়েই যাওয়া নিরাপদ। সেখানে ভুলভ্রান্তি কম হয়। কিন্তু মুশকিল হলো পাতাল রেল খুঁজে কোথায় পাই। সেন্ট্রাল লন্ডনে প্রতি বর্গমাইলে গোটা চারেক টিউব স্টেশন পাওয়া যায় এবং যেকোনো একটা পেলেই হলো। পাতাল দিয়েই গাড়ি বদল করে করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হয় না। সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে যতই দূরে হয় টিউব স্টেশনের একটা থেকে অন্যটার দূরত্বও বাড়তে থাকে। পাতাল রেলের স্টেশন খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে আবার বাসে চড়লাম। এবং ক্যানারি হোয়ার্ফে এসে নামলাম।

ক্যানারি হোয়ার্ফে এসে লন্ডন ডকল্যান্ড সম্বন্ধে কিছু কথা না বলে যাওয়া যায় না। ১৯৬০ সালের পূর্বে এই ডকল্যান্ড এলাকা ছিল চর এলাকা এবং এখানে নদী বন্দরে মালামাল নামানো-উঠানো ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজ হতো না। নতুন

www.pathagar.com

শতাব্দী আসছে এবং লন্ডন ভবিষ্যতে বিশ্বে কী, রূপে আবির্ভূত হবে, তা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভাবনা-চিন্তা শুরু করল। এ সময় মার্গারেট সরকার ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ৮ বর্গমাইল নিয়ে 'লন্ডন ডকল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন' গঠন করল। প্রথমত ফুড প্রসেসিংয়ের কাজ নিয়েই শুরু তারপর ধীরে ধীরে এখানে রিয়েল এস্টেটের কাজ প্রাধান্য পায়। শুরু হয় এলাকা উন্নয়ন। লন্ডন রেলওয়েকে এই পর্যন্ত প্রসারিত করা হয় এবং নাম দেয়া হয় ডকল্যান্ড রেলওয়ে। এই অঞ্চলে পাতাল রেলের সম্প্রসারণের জন্য জুবিলি লাইনের প্রবর্তন করা হয় এবং এর অর্ধেক খরচ বহন করে ক্যানাডার এক ডেভেলপার। ইউরোপের তিনটি সর্বোচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং সেগুলো হচ্ছে ১) ক্যানারি হোয়ার্ফ টাওয়ার, ২) এইচএসবিসি টাওয়ার এবং ৩) সিটি গ্রুপ সেন্টার।

এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে কাজ আশির দশকে হাতে নেয়া হলো ১৯৯০ সালে তা বেহাল অবস্থায় পড়ল এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, এই প্রজেক্টকে পরিত্যক্ত ঘোষণার পর্যায়ে এসে পৌঁছল। ক্যানারি হোয়ার্ফের মতো সুবৃহৎ অট্টালিকার কাজ বন্ধ করে দেয়া হলো। হতাশা যেন চারদিকে বিরাজ করতে থাকল। এ অবস্থা কিন্তু খুব বেশি দিন থাকল না। ১৯৯৫ সালে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা সমগ্র প্রজেক্টটাই কিনে ফেলল এবং একবিংশ শতাব্দীতে এটি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে পুনরায় উন্নয়নের কাজে হাত দিল। নুতন আগ্রহের সৃষ্টি হলো এবং রাতারাতি ডকল্যান্ডের জনসংখ্যা ১৩০০০ থেকে উন্নীত হয়ে ৬৩০০০ দাঁড়াল। নতুন নতুন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হতে থাকল এবং পরিত্যক্ত ডকল্যান্ড প্রজেক্ট ইউরোপের সর্ববৃহৎ প্রজেক্টে রূপ নিল।

বিকেল ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে। সারাটা দিনই ঘুরে বেড়িয়েছি বলে শারীরিক দুর্বলতাও একটু অনুভব করছি। তাই স্টেশনের বাইরে গিয়ে ডকল্যান্ডের পথঘাট ও বিশাল বিশাল অট্টালিকা দেখার আগ্রহ মোটেই অনুভব করলাম না। তাই স্টেশনের বাইরেই একটা ছোট পার্কে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ির পথে টিউবে করেই রওনা হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

চার.

পিকাডেলি ও সোহো

আজ আমার পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখার দ্বিতীয় দিন। আজকে ভাবলাম যে আমাদের বাড়ি ৫৪, হার্টস গ্রোভ থেকে নিকটতম আন্ডারগ্রাউন্ড টিউব স্টেশন উডফোর্ড হতে পাতাল রেলে গিয়ে পিকাডেলি সার্কাসে নামব এবং সেখান থেকে আজকের পদযাত্রা শুরু করব।

পাতাল রেল ভ্রমণ শুরু করার আগে উডফোর্ড টিউব স্টেশনের বাইরেই এক দোকান থেকে ভ্রমণকালীন ব্যবহারের জন্য আমি সাধারণত দু-একটা টুকিটাকি জিনিস কিনি; যথা পটেটো চিপ্‌স্‌, পোলো, লাইম জুস ইত্যাদি। সেই দোকানে আজও গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম গতকাল ওদের দোকানে আমার লাঠিটি রেখে গিয়েছিলাম কি না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার লাঠি আমাকে ফেরত দিল এবং বলল, 'লাঠি হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সের সাথী, আমি গতকাল তোমাকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি বলে দিতে পারিনি। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে আমার বোঝা তিনি হালকা করে দিয়েছেন।' আমি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম, কিন্তু তিনি সেদিকে কর্ণপাত না করে আবারও বলতে থাকলেন যে, লাঠি হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সের সাথী। তুমি তোমার স্ত্রীকে হারিয়েছ তাই আমি পেরেশান ছিলাম, কিভাবে কোথায় তোমাকে আমি পাব এবং তোমার বর্তমান নির্ভরযোগ্য সাথী লাঠিটিকে ফেরত দেব? বলা বাহুল্য এই দোকানি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকেও চিনতেন, তাই আমাদের মধ্যে কিছুটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল ১৯৯৫ সাল থেকেই।

আমি পিকাডেলিতে নামলাম এবং রিজেন্ট পার্কের কোনো দিয়ে ভূপৃষ্ঠে উঠলাম।

www.pathagar.com

চোখের সামনে ভেসে উঠল Regent Palace Hotel. ৫৩ বছর আগে যখন প্রথম লন্ডনে আসি তখন এই রিজেন্ট প্যালেস হোটেলেই উঠেছিলাম। হোটেলটি এখনো অবিকল আগের মতোই রয়েছে। আমাদের ঢাকায় যেমন বছরে বছরে কোনো জায়গার রূপ বদলে যায়, সেখানে লন্ডনে ৫০ বছরেও খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। এর কারণ হচ্ছে এরা পুরনোকে ধ্বংস করে না বরং হেরিটেজ অর্থাৎ উত্তরাধিকার হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সমাজব্যবস্থা এখানে স্থিতিশীল; তাই উচ্ছেদ, জবরদখল এবং পুনরায় উচ্ছেদের নাটক এখানে সাধারণত শোনা যায় না। ভাঙাচুরা খেলায় এ দেশের লোক মেতে ওঠে না। যার যা আছে তাই নিয়েই এখানকার লোক সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করে। বলবানরা ছলে-বলে, কৌশলে দরিদ্রের ধনসম্পদ লুটে নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় না। তাই আজ ৫৩ বছর আগেকার সেই স্মৃতিই চোখের সামনে ভেসে উঠল এবং সেই পুরনো পরিবেশ যেন আমাকে আবিষ্ট করে তুলল। মনে হলো কোণের দোকানটি এখনো ঠিক তেমনটিই আছে। রাস্তার ভিড় যেন স্থিতিশীল অবস্থায়ই আছে। তবে কি এদের দেশে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়, নাকি হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে;কিন্তু অত্যন্ত বিচার-বিবেচনার পর পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ হাতে নেয়া হয় এবং যথা সময়ে তা শেষ করা হয়। এর উদাহরণ আমি আমার বই 'জীবন তরঙ্গে' Kings Road প্রশস্তকরণের চিত্র বর্ণনায় তুলে ধরেছিলাম। ২০-৩০ বছর আগে তারা পরিকল্পনা করে এবং সকলের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রেখে তারা পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়।

আজ বৃহস্পতিবার ১৭ জুলাই ২০০৩ সালে পত্রিকায় দেখলাম যে প্রায় ৪০টি ছয়তলা বিশিষ্ট কমিউনিটি হাউস ভেঙে ফেলবে কেননা ১৭ বছর আগে এই দালানগুলো যখন তৈরি হয়েছিল তখন তাতে কিছু খুঁত ধরা পড়েছিল, যার ফলে কিছু কিছু বিল্ডিংয়ের ছাদ ধসের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। নবনির্মিত বিল্ডিংগুলো তখন মোটেই অব্যবহারযোগ্য ছিল না তাই সেখানে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছিল এই শর্তে যে, প্রতি বছর জরিপ করে দেখা হবে যে বাড়ির অবস্থা কীরূপ এবং জরিপের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বর্তমান জরিপে কিছু কিছু বিল্ডিংয়ের ছাদে ফাটল দেখা গেছে তাই এগুলোকে অব্যবহারযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই ৪০টি বিল্ডিং গুঁড়িয়ে ফেললে প্রায় ১০০০ পরিবার সাময়িকভাবে গৃহহীন হয়ে পড়বে কিন্তু বিপজ্জনক অবস্থায় বসবাস করার চেয়ে কিছু দিন অসুবিধার মধ্যে বাস করা এরা শ্রেয় মনে

www.pathagar.com

করে। তাই সরকার সকল বাসিন্দাকে জানিয়ে দিল কখন কোন বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কোথায় তাদের স্থান দেয়া হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাসিন্দারা সময়মতো সাময়িক বাসস্থানে চলে যেতে পারে। এই ভাঙা-গড়া কাজের পর নতুন বাসস্থানে কারা কারা উঠে যেতে চায় এবং তাদের কত করে টাকা দিতে হবে তাও কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেয়। ২০১৫ সালের মধ্যে পুরনো বাসিন্দারা তাদের নতুন ঘরে উঠে যেতে পারবে। সেই ঘরগুলো স্থানে নির্মাণ করা হবে নতুন আবাসিক এলাকা।

অক্সফোর্ড স্ট্রিট

যে বাসাগুলো ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার দু-একটা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদের ঢাকার ৫০ বছর আগে নির্মিত আজিমপুর কলোনির বাড়ির অবস্থা থেকে সেগুলোর অবস্থা অনেক ভালো ছিল। মানুষের নিরাপত্তার দিকে আমরা খেয়াল করি না। আল্লাহই আমাদের রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা তৃপ্ত থাকি। নিজ থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসি না। রাজমণি থিয়েটারের কাছে ঢাকার বুকে ফরিদপুর ম্যানসন গত ৪০ বছর ধরে পড়ো পড়ো অবস্থায় রয়েছে। আমাদের কর্তৃপক্ষ এটা নিয়ে কী করবে–ভাঙবে-না গড়বে এই

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। শুনেছি ডিআইটি (ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট) ভাঙারই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল কিন্তু এর মালিক ভাঙার আদেশের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয় এবং হাইকোর্টে রিট করে দেয়। এর ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তার কারণে এই পড়ো পড়ো অট্টালিকাটি ভাঙা সম্ভব হচ্ছে না ৩০-৪০ বছর ধরে । একদিন হয়তো এটা ভাঙার দরকারই পড়বে না, নিজে নিজেই ভেঙে পড়বে এবং অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটবে। তখন আমরা সজাগ হব, তদন্ত কমিটি গঠন করব, তদন্ত হবে, রিপোর্ট তৈরি হবে কিন্তু প্রকাশিত হবে না। সুতরাং এতগুলো লোকের প্রাণহানির জন্য কে বা কারা দায়ী তা থাকবে অনুদঘাটিত। কারো শাস্তি হবে না এবং আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে চলব।

ভূপৃষ্ঠে পিকাডেলি সার্কাসে (Statue of EROS) গ্রিক দেবতা ইরসের মূর্তি অবস্থিত। এই স্থানটিকে সমগ্র লন্ডনের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়। এখান থেকেই আজকের যাত্রা শুরু করব।

লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাস

গ্রিক দেশের পুরাণতত্ত্ব মতে, ভালোবাসার দেবতা Eros-এর মূর্তিটা পিকাডেলি সার্কাসে ঠিক আগের মতোই বিদ্যমান। ৫০ বছর আগে নব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে যে আবেগ নিয়ে আমরা নওজোয়ানরা Eros-এর পাদমূলে সমবেত হতাম তা কি বর্তমান বয়সে সম্ভব? তাই আজ সবকিছুই আছে, নেই শুধু নবীন প্রাণ ও নবীন দৃষ্টিভঙ্গি। পিকাডেলি সার্কাস এখনো আগের মতোই আছে। কিন্তু লেখকের মন ও মানসিকতার পরিবর্তনের দরুন ৫০ বছর আগের সেই সম্মোহনী

www.pathagar.com

শক্তি নেই, সেই আনন্দ নেই এবং সেই আবেগ নেই। তাই আজ মনে হলো ভালোবাসার দেবতা ইরস প্রাণহীন।

ইরস মূর্তিটি যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানে জনহিতৈষী লর্ড সাফট্সব্যারির একটি স্মৃতিসৌধ ছিল। সে মূর্তিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ওই স্থানেই ইরসের মূর্তিটি স্থাপন করা হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। সাফট্সব্যারীর মূর্তিটি নেই বটে কিন্তু তার বদলে পিকাডেলি থেকে উত্তর দিকে নির্গত হয়েছে তারই স্মৃতিবাহক লন্ডনের অন্যতম বিখ্যাত রাস্তা সাফট্ব্যারি এভিনিউ। ১৫০ ফিটের মতো ব্যাসসম্পন্ন পিকাডেলি চত্বরটির মোটামুটি কেন্দ্রবিন্দুতে বর্তমানে ইরসের মূর্তিটি অবস্থিত। মূর্তিটির চারদিকে প্রায় ৬০ ফিট ব্যাসের একটি চত্বর যেখানে সর্বক্ষণই ভক্তরা

পিকাডেলিতে ইরসের মূর্তি

আলাপচারিতায় সময় কাটায় কিংবা বিশ্রাম করে। এর চারদিকে যানবাহন চলার গোলাকার রাস্তা তাও ২৫ ফিটের বেশি চওড়া হবে না। যানবাহন চলার রাস্তার পর পায়ে হাঁটার জন্য ২০ ফিটের মতো প্রশস্ত ফুটপাথ। তার পরই বড় বড় দোকান। এই অঞ্চলটিতে সারাক্ষণই অত্যধিক ভিড় থাকে তাই এখানে যে কোনো প্রকার পার্কিং নিষিদ্ধ।

পিকাডেলিতে উইন্ডমিল থিয়েটারটি অবস্থিত। এই সেই থিয়েটার যাদের গর্ব

www.pathagar.com

হচ্ছে যে, তারা ১৯৩৩ সনে থিয়েটারটি উদ্বোধন করার পর থেকে এক দিনের জন্যও বন্ধ রাখেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও যখন লন্ডনবাসী জার্মান বোমার ভয়ে শুধু এয়ার রেড শেলটার খুঁজে বেড়াত এবং সেখানেই রাতভর আশ্রয় নিত তখনো এই থিয়েটার তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। এদের মূলমন্ত্র হচ্ছে We never close অর্থাৎ অমরা কখনো বন্ধ রাখি না। এই থিয়েটারের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, ওখানে স্টেজে উলঙ্গ নারীমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকত। নগ্নভাবে অ্যাকটিং করা ইংল্যান্ডে আইনবহির্ভূত। মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থেকে স্টেজের শোভা বর্ধন করাকে অ্যাক্টিংয়ের পর্যায়ে ফেলা যায় না, তাই উইন্ডমিলের সূক্ষ্ম চাতুরি আইনের চোখে ধরা পড়ত না। এভাবেই উইন্ডমিল তাদের জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল লন্ডনের বোমা ঝরা দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতেও। পিকাডেলি চত্বরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েই আমি আমার যাত্রা শুরু করি। এই চত্বর থেকে পাঁচটি বড় রাস্তা বেরিয়েছে। যথা–১) সাফট্সব্যারি এভেনিউ, যা উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় আধা মাইলের মতো দূরে চেয়ারিং ক্রস রোডে গিয়ে মিশেছে। ২) রিজেন্ট স্ট্রিটও বেশ বড় রাস্তা। উত্তর-পশ্চিম দিকে গিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে মিশেছে। ৩) পিকাডেলি সার্কাসের পশ্চিম দিক থেকে বেরিয়েছে পিকাডেলি রাস্তা। ৪) দক্ষিণ দিক থেকে হে মার্কেট স্ট্রিট এবং ৫) রিজেন্ট স্ট্রিটের দক্ষিণাংশ।

আমি SOHO-এর দিকে যেতে চাই। সোহো অঞ্চলটাই হচ্ছে রিজেন্ট স্ট্রিট, অক্সফোর্ড স্ট্রিট, চেয়ারিং ক্রস এবং সাফট্সব্যারি এভেনিউ বেষ্টিত এলাকাটি। পিকাডেলি সার্কাসের ঠিক উত্তরে অবস্থিত প্রায় এক বর্গমাইল এলাকা। মনে পড়ে ১৯৫৭ সালে লেফটেন্যান্ট মোতাহার হোসেন ফারুখের পিতা জনাব আবদুর রব আমাকে এবং আমার গৃহিণীকে সোহোর লিয়নস নামক এক রেস্তোরাঁতে সান্ধ্য ভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন। মিস্টার রব ছিলেন প্যারিসে পাকিস্তানের কমার্শিয়াল অ্যাটাসি। সেইকালে সোহো ছিল লন্ডনের সম্ভ্রান্ত ও ব্যস্ততম সপিং সেন্টার West End-এ অবস্থিত। মিস্টার ও মিসেস রবের সাথে আমার কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তাঁদের ছেলে লেফটেন্যান্ট মোতাহার হোসেন ফারুখ আমার অধীনে কাজ করত এবং তার কাছেই আমাদের সম্বন্ধে জানতে পেরে দাওয়াতটা দিয়েছিলেন। সোহো ছিল এবং এখনো আছে– লন্ডনের রাতের জীবনের প্রাণকেন্দ্র। সোহো ঘিরে গড়ে উঠেছে শতাধিক ছোট-বড় রেস্তোরাঁ, প্রায় ২০-৩০টি সিনেমা হল, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে ইত্যাদি, তা ছাড়া প্রমোদ বালাদের নৈশবিহার এই অঞ্চলের আকর্ষণ বাড়ায় এবং লন্ডন শহরের ডন জওয়ানদের প্রতিযোগিতা এখানেই হয়।

www.pathagar.com

বৃষ্টি হচ্ছিল এবং তারই মধ্যে ছাতা মাথায় ধীরে ধীরে চলেছি সোহোর দিকে। কিছু দূর গিয়ে অনুভব করলাম যে, ভুলে আমি আমার নির্ধারিত রাস্তা ধরে চলছি না। আমি কভেন্ট্রি স্ট্রিট ধরে চলেছি। সাথে সাথেই আমার গতি পরিবর্তন করে উইন্ডমিল স্ট্রিট ধরে আবার সাফট্সব্যারি এভেনিউতে গিয়ে পড়লাম এবং সাফট্সব্যারি এভিনিউ ধরে চেয়ারিং ক্রস রোডের দিকে রওনা হলাম। প্রায় আধা কিলোমিটার যাওয়ার পর বাম দিকে ফার্থ স্ট্রিট পেলাম। এবারে সোহোতে পৌঁছা অতি সহজ হয়ে উঠল। ফার্থ স্ট্রিট ধরে আধা কিলোমিটার উত্তরে গেলেই সোহো স্কোয়ার। লন্ডন শহরের রাস্তাসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা থাকে। প্রত্যেকটি রাস্তার কোণেই ওই রাস্তাটির নাম সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে। তাই আমাদের দেশের প্রথা মতো অন্যান্য বাড়ির গেটে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে ঠিকানা বের করার হয়রানি পোহাতে হয় না।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ইংরেজরা বাইরে বেরোলেই তাদের হাতে থাকত একটা ছাতা এবং মাথায় থাকত একটা ফেল্ট হ্যাট অর্থাৎ ফেল্টের টুপি অথবা বাউলার হ্যাট। ক্ষেতখামারে কাজ করার জন্য পিক ক্যাপ। ছাতা এবং টুপি ছাড়া সেকালে কেউ বেরোত না। এটাই ছিল সাধারণ পোশাকের অঙ্গ। বিশ্বায়নের ফলে এখন পোশাক-আশাকের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সে ছাতাও নেই লাঠিও নেই সেই টুপিও নেই। এখন আছে শুধু নেড়ে ইংরেজ।

উইন্ডমিল স্ট্রিট, ফার্থ স্ট্রিটের দু পাশেই রেস্তোরাঁগুলো এবং বিশেষ বিশেষ ক্যাফে পেছনে বেসে সোহো স্কোয়ারে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম। বৃষ্টি ঝরে গেছে। ইংল্যান্ডে এই একটা সুবিধা বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। আমাদের দেশে যেমন অঝোরে বৃষ্টি হয়, তা এখানে হয় না বললেই চলে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হয় এবং কিছুক্ষণ পরপর তা থেমেও থাকে কিছুক্ষণ। প্রকৃতি যেন মানুষের সাথে সখ্যের জন্যই যেন এই ব্যবস্থা। বৃষ্টির বৃষ্টিও হবে এবং মানুষ তার কাজ-কর্মও চালিয়ে যেতে পারবে।

সোহো স্কোয়ারের চারদিকেই বড় বড় দালানকোঠা। লম্বায় প্রায় ৩০০ ফিট এবং প্রস্থে ২০০ ফিট আয়তনের বাগান। চারদিকের প্রায় ৩০ ফিট প্রশস্ত রাস্তাটা বাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। অবশ্য লন্ডনের প্রায় সব বাগানই এরূপ সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। কথায় আছে না যে, ক্ষিধে পেটে সব কিছুই অমৃত মনে হয়; তেমনি পরিশ্রান্ত অবস্থায় যেকোনো প্রকারের বিশ্রামের স্থানও অতি আরামদায়ক মনে হয়। তাই পার্কের বৃষ্টিভেজা টুল এবং ওপরে গাছের পাতা ঝরা দু-এক

www.pathagar.com

ফোঁটা বৃষ্টির পানিও আমার বিশ্রামের কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটানো না বরং কেন যেন এই নিভৃতে পার্কের জনমানবহীন ও আর্দ্র পরিবেশ অত্যন্ত সুখকর মনে হচ্ছিল। এ বনে আমিই রাজা। এ পার্কে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বেলা ১টার দিকে এই অঞ্চলে বোধ হয় মধ্যাহ্ন বিরতি হয়, তাই দেখতে পেলাম সোয়া একটার দিকে দু-একজন করে এই পার্কে ঢুকছে। একক সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় আসে– তরুণ-তরুণী, লাঞ্চ-প্যাকেট খোলে, পানীয়ও কিছু একটা বের করে এবং মিনিট ২০-২৫ এখানে গল্পগুজবে মধুর সময় কাটিয়ে আবার নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যায়। দু-চারজন প্রবীণ বয়সের লোকও আসে একই উদ্দেশ্যে । তারাও স্যান্ডউইচের প্যাকেট খোলে, ফিজি পানীয় কিছু একটা পান করে এবং ঘোড়দৌড় কিংবা ফুটবলের কিছু তথ্য আদান-প্রদান করে বিদায় নেয়। একটা জিনিস লক্ষণীয় আর তা হচ্ছে ডিমের খোসা, কিংবা স্যান্ডউইচের খালি মোড়ক কিংবা খালি কোক কিংবা ফিজি পানীয়ের বোতল কিংবা প্যাকেট কেউই যত্রতত্র ফেলে যায় না। খাবার শেষে অত্যন্ত যত্নসহকারে এগুলো কুড়িয়ে প্যাকেটে ভর্তি করে পাশেই রাখা বিনে ফেলে দিয়ে যায়। পার্ক একদম পরিষ্কার থাকে। একটি সিগারেটের শেষাংশ দেখা যায় না। লন্ডন এবং বিদেশী শহরগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূলমন্ত্র এখানে নিহিত। পঞ্চাশ দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন লন্ডনে যাই তখন সর্বত্রই দেখতাম লেখা থাকত Waste not Want not অর্থাৎ অপচয় কোরো না চেয়ো না। এখন এ দেশের অলিখিত রীতি হচ্ছে নিজের দেশকে নোংড়া করোনা। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এই মন্ত্রটি এমনভাবে মগজে গেঁথে গেছে যে ছেলে, বুড়ো, জওয়ান সবাই এই মন্ত্রে দীক্ষিত। অতি পরিচ্ছন্ন পার্কটি দেখে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তাদের জাতীয় ইমানের অঙ্গ। আমিও পটেটো চিপসের প্যাকেট খুললাম এবং একটা কোমল পানীয়ের সদ্ব্যবহার করে ঘণ্টাখানেক সময় এই স্কোয়ারে ব্যয় করে গেলাম এবং আমাদের ধর্মীয় ঈমানের অঙ্গ হিসেবে আহারের পর বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দিয়ে পুনরায় এসে বেঞ্চে বসলাম।

আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। তাই বেঞ্চেই বসে বসে লন্ডনের ওপর যে চটি বইটি আমি কিনেছি তার ওপর চোখ বুলাতে থাকলাম। বইটির গোড়াতে লেখা আছে “The best way to see the Capital is by a combination of underground (tube) and walking অর্থাৎ লন্ডন দেখার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ভূনিম্নের টিউব ব্যবহার করে এবং পায়ে হেঁটে। এই পন্থাতেই আমি লন্ডন দেখতে বেরিয়েছি। বইটিতে আরো কিছু তথ্য পেলাম যা থেকে সোহোর ইতিহাসের কিছু

www.pathagar.com

ধারণা পাওয়া গেল। এই অঞ্চলটি ওয়েস্ট মিনস্টার এবং বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে খুব একটা দূরে নয় বলে এই অঞ্চলটিকে রাজকীয় বনভূমি হিসেবে গণ্য করা হতো। রাজা এবং সভাসদগণ প্রায়ই আনন্দস্ফূর্তি, বনবিহার এবং কিছুটা শিকারের জন্য এখানে আসতেন। সে সময় Hunting Cry শিকারের সময় সংকেতমূলক চিৎকার ধ্বনি ছিল সো.... হো....। সেই দীর্ঘায়িত সো... হো... আওয়াজ থেকেই বর্তমানের সোহোর উৎপত্তি। সপ্তদশ শতাব্দীতে সোহো বনভূমি বিক্রি করে দেয়া হয় এবং এখানে গড়ে ওঠে জনবসতি। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ থেকে বহু বহিরাগত এসে প্রশাসনিক কেন্দ্রের কাছে এই সোহোতে বসবাস করতে থাকে। গ্রিকরা আসে। সোহো অঞ্চলে গ্রিক স্ট্রিটের নাম সেখান থেকেই। বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস ১৮৪৯ সালে ডিন স্ট্রিটে এসে বাসা বাঁধে। ইউরোপ থেকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আসায় সোহোতে একটা আন্তর্জাতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এখানকার ভাব-ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি মিলিয়ে স্বল্প পরিসরে হলেও সামাজিক কৃষ্টির মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সোহো হয়ে ওঠে নিশীথের স্বর্গরাজ্য। সে ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বিংশ শতাব্দীতে দুটো মহাযুদ্ধে বিতারিত ফরাসিরা দেশ ছেড়ে সোহোর ডিন স্ট্রিটে আশ্রয় নেয় এবং এখনো বহাল তবিয়তে সেখানেই আছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সোহোতে নাট্যমঞ্চ, সিনেমা হল, থিয়েটার জগৎ এবং রাতের ক্লাব প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল যৌনাচারীদের অবাধ বিচরণ ভূমি। তখন ইংরেজ সরকার উপলব্ধি করে যে আয়ের চেয়ে দেশের বদনাম বেশি হচ্ছে। তখন অপকর্ম রোধে পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়।

আজ আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে তাই উর্দুতে যাকে বলে তশরিফ উঠালাম অর্থাৎ আড়মোড়া ভেঙে বেঞ্চ থেকে গাত্রোত্থান করলাম এবং আবার পথ চলতে শুরু করলাম।

www.pathagar.com

পাঁচ.

ট্রাফালগার স্কোয়ারের পথে

সোহো স্কোয়ারে বসে সদ্য কেনা 'লন্ডন' নামক ছোট বইটির পাতা উল্টাতে গিয়ে নজরে পড়ল ১৩৪৭ সালের 'ব্ল্যাক ডেথ' অর্থাৎ কালো মৃত্যুর কাহিনী। ছোট বেলায় আমাদের স্কুলের পাঠ্য কার্যক্রমের আওতায় ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়তে হতো। তখন ছিল ব্রিটিশ যুগ এবং আমরা ছিলাম অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশদের প্রজা। ব্ল্যাক ডেথের কাহিনী পড়ে তখন মনে হতো রূপকথা। একদিন রোগের আবির্ভাব– শরীরের গ্রন্থি ও সংলগ্ন নালী ফুলে যাওয়া। দ্বিতীয় দিন অধিক মাত্রায় শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া এবং সাথে সাথে শরীরের ত্বকে কালো কালো দাগ ফুটে ওঠা। তৃতীয় দিনে শরীর সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে যাওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসার উপক্রম হওয়া এবং চতুর্থ দিনে ইহধাম ত্যাগ করা। ধারাবাহিকতা ছিল খুবই সহজ কিন্তু মৃত্যুটা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। ডাক্তার-বৈদ্য দেখানোর আগেই সব শেষ। আজ সোহো স্কোয়ারে বসে ব্ল্যাক ডেথের করুণ কাহিনী পড়ে এবং লাখ লাখ লোকের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। এই রোগ এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে। টার্টার সৈন্যদের মধ্য দিয়ে ইউরোপ হয়ে মাত্র বছরখানেকের মধ্যেই অত্যন্ত ছোঁয়াচে এই রোগ লন্ডনে চলে আসে। এক নাবিক এই রোগ নিয়ে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে ডরসেট বন্দরে অবতরণ করে। রোগ নিরূপণ করার আগেই সে মারা যায় এবং আরো অনেকের মাঝেই রোগের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই এই রোগ মহামারীতে রূপ নেয়। লন্ডনের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক এতে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই মহামারী আকারে সমগ্র ইংল্যান্ডে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সেই কালে লন্ডনের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭০,০০০। তার

www.pathagar.com

মধ্যে ৩০,০০০ এই রোগে প্রাণ হারায় । যম যেন ঘরের কোণেই বসে থাকত শুধু ছুঁয়ে দিলেই হলো । মৃত্যু তখন অবধারিত । অসহায় দিশেহারা মানুষ ভয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিল এবং বয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের অজান্তে এই রোগের ব্যাকটেরিয়া ।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, তখনকার রানী প্রথম এলিজাবেথ রোগের ভয়ে তাঁর শাসনকেন্দ্র লন্ডন থেকে সরিয়ে উইন্ডসরে নিয়ে যান । উইন্ডসর অঞ্চলে যাতে রোগ বিস্তার লাভ না করতে পারে তার জন্য তিনি ফরমান জারি করেন যে, বিনা আহ্বানে যদি কেউ উইন্ডসর অঞ্চলে যায় তাহলে তাকে দেয়া হবে মৃত্যুদণ্ড । চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা কেউ ভাবলনা শুধু নিরাপত্তার জন্য যারা পারে তারাই লন্ডন থেকে সরে গেল গ্রামাঞ্চলে এবং অনেকেই রোগের বীজ বহন করেই নিয়ে গেল । এভাবেই সমগ্র ইংল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এই রোগ । পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ১৩৪৭ থেকে ১৩৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই রোগের বীজ ছড়িয়ে পড়ে । ইংল্যান্ডের সর্বমোট তৎকালীন ৫০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ২০ লাখই মারা গেল এই রোগে । পাদ্রিরা জনসেবায় নিজেদের বেশি নিয়োজিত রেখেছিল বলে তাদের আনুপাতিক মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৫০% ।

ব্যুবোনিক এবং নিমোনিক ব্যাকটেরিয়াই ছিল এই রোগের উৎস । কিন্তু এই তথ্য জানতে অনেক সময় লেগেছিল বলে মৃত্যুর হার রোধ করা সম্ভব হয়নি । এই রোগকে ব্ল্যাক ডেথ বলা হতো এই কারণে যে, মৃত্যুর সময় রোগীর শরীর কালো হতে হতে সম্পূর্ণ কালো হয়ে যেত । ইঁদুরের মধ্য দিয়েই এই রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ করেছিল ।

ব্ল্যাক ডেথের কারণে ইংল্যান্ডের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায় । চাষিরা মৃত্যুর ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে । ক্ষেত-খামারে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় । মাঠ পড়ে থাকে অনাবাদি । গরু-ঘোড়াগুলোকে দেখভালের জন্য লোকাভাব দেখা যায় এবং তাই ওই সব গৃহপালিত পশুকে ছেড়ে দেয়া হয় চড়ে খাবার জন্য । কৃষি ও খামারব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে । শিল্পাঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশি বলে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ খারাপ বলে শ্রমিকরা গ্রামের দিকে চলে যায় । শিল্পাঞ্চল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনও বন্ধ হয় এবং ইংল্যান্ডে প্রায় সব কিছুরই ঘাটতি দেখা দিতে থাকে । কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় খাদ্যাভাব দেখা দেয় প্রবল আকারে । গ্রামাঞ্চলে গিয়েও নিস্তার নেই । ভয়াবহ রোগ এবং

www.pathagar.com

এর প্রকোপে প্রকট খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং সারা ইংল্যান্ডের প্রায় অর্ধেক লোকের মৃত্যুর পর তৎকালীন অজ্ঞ ইংরেজরা উপলব্ধি করে যে, এই রোগ ইঁদুরের লোমে বাসরত এক প্রকার উড্ডীয়মান কীট থেকে ছড়ায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এই রোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

১৩৫০ সনের পর এই রোগের প্রকোপ কমে গেল বটে; কিন্তু তার পরও ২-৩ শতাব্দী লেগেছে ইংল্যান্ড থেকে এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করতে। এই রোগের ভয়াবহতা কমে আসার পর ইল্যান্ড আবার দেশ গড়ার কাজে মন দিল। যে সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ উল্টেপাল্টে গেছে তাকে নতুন করে গড়তে গিয়ে উন্নততর পথেই অগ্রসর হতে হলো। ইংল্যান্ডের নবজাগরণ সেখান থেকেই। ব্ল্যাক ডেথের কারণেই ইংল্যান্ডে মধ্য যুগের প্রারম্ভেই অগ্রযাত্রার সূচনা হয় এবং ইংল্যান্ড বিশ্বদরবারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

বাবুই পাখির মতো সারাদিন ধরে খেয়ালের জাল বুনলে আমার চলবে না তাই সেই মুহূর্তে আরামদায়ক কাঠের বেঞ্চের আস্তানা ছেড়ে আমাকে উঠতে হলো। আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে বটে তবে মলিনতা কাটেনি তাই যে কোন মুহূর্তে আবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

হাঁটাটা পরিশ্রমের কাজ হলেও চারদিকে দেখে-শুনে ধীরে ধীরে হাঁটতে আনন্দই অনুভূত হয়। এ না হলে কেউ Window shopping করে অর্থাৎ (সদর রাস্তায় দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে জিনিসপত্রের ধরন ধারণ এবং মূল্যাদি দেখে) ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারত? আমি সোহো স্কোয়ার থেকে পূর্ব দিক দিয়ে সাটন রোড হয়ে চেয়ারিং ক্রসে পড়লাম। শ খানেক ফিট উত্তরেই লন্ডনের বৃহৎ চার রাস্তার মোড়ে টটেনহাম কোর্ট টিউব স্টেশন। টিউব স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে লন্ডনের বিখ্যাত অক্সফোর্ড স্ট্রিট চলে গিয়েছে হাইড পার্ক পর্যন্ত। পূর্ব দিকে নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিট, উত্তরে টটেনহাম কোর্ট রোড এবং দক্ষিণে চেয়ারিং ক্রস রোড। এই অঞ্চলে সর্বক্ষণ লোকে লোকারণ্য থাকে।

টটেনহাম কোর্ট রোডে গিয়ে আপনি যেকোনো প্রকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী কিনতে পারেন। এই অঞ্চলের প্রায় ৬০ ভাগ দোকানই ভারতীয়দের দিয়ে পরিচালিত। বংশপরম্পরায় এখানে এরা পসার জমিয়ে বসেছে। বাঙালিদের জন্য এটা যেন স্বর্গ। রেডিও-টেলিভেশন, ক্যাসেট প্লেয়ার, কম্পিউটার, ওয়াকিটকি, টেপ রেকর্ডার এবং নাম না জানা হরেক রকমের ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে ভর্তি এই

www.pathagar.com

এলাকা। এমন কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের নাম আপনি করতে পারবেন না যা এই রাস্তার দু ধারে বড় বড় দোকানে না পাওয়া যাবে। সব ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যায়–এ ধরনের সুখ্যাতির পাশাপাশি কিছুটা বদনামও আছে। এখান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যাওয়ার পর ঘরে গিয়ে যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তার পরিবর্তে টাকা ফেরত পাওয়া তো দূরের কথা, সমমূল্যের অন্য দ্রব্য পেতেও হিমশিম খেতে হয়।

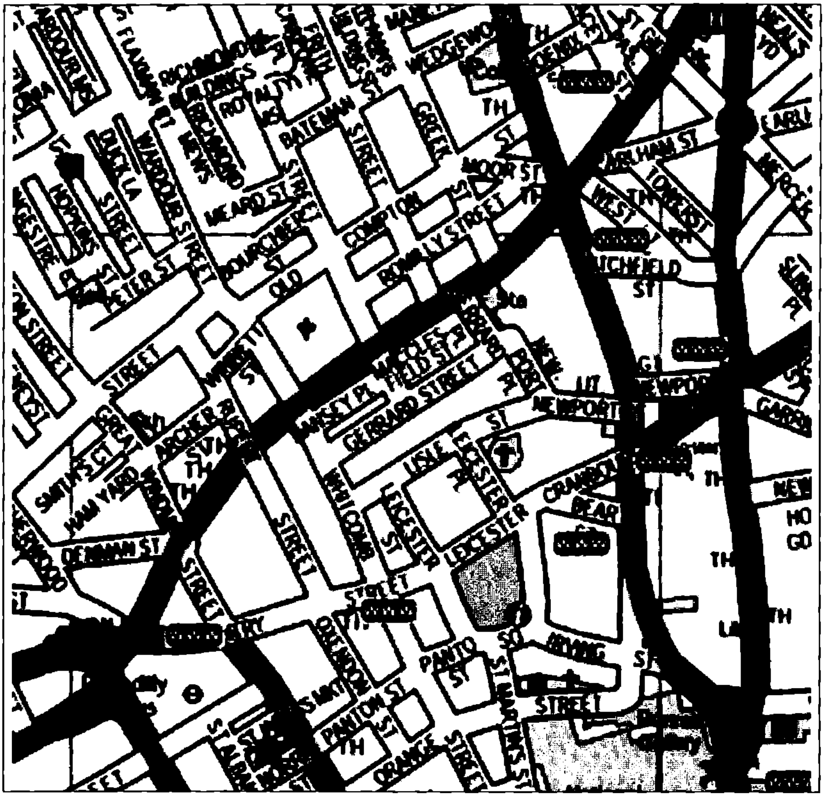

সাফট্‌সবেরি এভিনিউ ও চেয়ারিং ক্রস চিহ্নিত এলাকা

আমি আজ টটেনহাম রোড ধরে উত্তরে যাচ্ছি না। আমার গন্তব্য হচ্ছে চেয়ারিং ক্রস রোড ধরে দক্ষিণে যাওয়া। তবে এই স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করছি। অক্সফোর্ড স্ট্রিট হচ্ছে লন্ডনের বিখ্যাত রাস্তা এবং বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর কেন্দ্রস্থল। সেলফ্রিজ, বুটস, ডেবেনহাম, জন লুইস, সেইন্সবেরি এবং এরূপ আরো শত শত

www.pathagar.com

দোকান রয়েছে এই রাস্তার দু পাশে। নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিটের অবস্থাও একই রূপ।

চেয়ারিং ক্রস রোড এবং সাফট্সব্যারি এভিনিউয়ের জংসন ও লেস্টার স্কোয়ার এলাকাটা কেম্ব্রিজ সার্কাস নামে পরিচিত। ইংরেজদের উচ্চারণের কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেভাবে না বললে সাধারণ লোক বুঝতেই পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমার গৃহিণীর ভাষ্য দিয়েই শুরু করি। ১৯৫০ দশকে একদিন তিনি বাসে চড়ে কেমব্রিজ সার্কাস যাচ্ছেন। কনডাক্টর টিকিট চাইল। আমার গৃহিণী কেমব্রিজ সার্কাসের টিকিট চাইলেন; কিন্তু কনডাক্টর বুঝতে পারছে না। অত মোলায়েমভাবে মিহি সুরে আমার গৃহিণী বলছেন। অন্য এক ইংরেজ এগিয়ে এসে বলল, 'ইনি খেমব্রিজ সার্কাসের টিকিট চাইছেন।' আমার গৃহিণী সেদিন ঘরে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ না গো, এরা কী অসভ্য, ধমক না দিয়ে বললে কোনো কথার আমলই দেয় না।' ইংরেজিতে যেভাবে লেখা হয় তাতে আপনি কেমব্রিজ সার্কাস বলবেন, তবে বলার সময় ধমকের সুরে খেমব্রিজ বলতে হবে। লেস্টার স্কোয়ারের বানান ধরে পড়তে গেলে বলতে হবে লেআইসেস্টার স্কোয়ার কিন্তু এভাবে বললে কোন ইংরেজ বুঝবে না। তারা প্রথম দু-অক্ষর 'le...লে' ঠিকই বলবে, মধ্যের এরপর... 'আইস'টুকু গিলে ফেলবে এবং পরের 'ster .. স্টার'টুকু উচ্চারণ করবে। তাই সংক্ষেপে দাঁড়াবে লেস্টার। এরূপ ঝুরি ঝুরি উদাহরণ রয়েছে। চেয়ারিং ক্রস ধরে আমি দক্ষিণে যাব। তাই সে দিকেই রওনা হই।

চেয়ারিং ক্রস রাস্তাটি সর্বমোট মাইলখানেক লম্বা হবে। অক্সফোর্ড ও টটেনহাম কোর্ট রোড থেকে নির্গত হয়ে চেয়ারিং ক্রস রাস্তাটি ট্র্যাফালগার স্কোয়ার পর্যন্ত গিয়েছে। রাস্তায় পড়ে অসংখ্য সিনেমা ও থিয়েটার হল ।

চেয়ারিং ক্রস রোড ধরে হাঁটব আর আগাথা কৃস্টির লিখিত মঞ্চনাট্য মাউসট্র্যাপ সম্বন্ধে কিছু না বলে চলে যাব– এটা কখনো হয়? তাই যতটুকু জানি ততটুকুই লিপিবদ্ধ করি। এই রহস্য নাটক লেখিকার জন্ম ১৮৯০ সালে, ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের শহর টর্কিতে। রহস্য সিরিজের লেখক হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন তিনি। তার বই 'মাউস ট্র্যাপ' লন্ডন শহরের লেস্টার স্কোয়ারের কাছে অ্যামবাসেডর থিয়েটারে ২৫ নভেম্বর ১৯৫২ সাল প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই নাটকটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে পররর্তী ২২ বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত অ্যামবাসেডর থিয়েটারেই এটা চলতে থাকে। তারপর পাশেই সেন্ট মার্টিন নামক থিয়েটারের নাট্যমঞ্চে এটা স্থানান্তরিত হয় এবং অদ্যাবধি সেখানেই

www.pathagar.com

নিয়মিত এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। ২ ঘণ্টাব্যাপী রহস্যে ভরা এই রোমাঞ্চকর নাটকের চাহিদা এত বেশি যে ৬ মাস আগে টিকিট না কাটলে কোনো শো দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঠিক এ কারণেই এই নাটকটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বর্তমানে যেকোনো শোতে টিকিটের মূল্য মাত্র ৪০ পাউন্ড-বর্তমান বাংলাদেশী টাকার মূল্যে ৪৬০০ টাকা। সেন্ট মার্টিন থিয়েটার হলটিও বেশ বড়। সর্বমোট ৫০০-এর অধিক দর্শক এতে এক শোতে স্থান পায়। তারপরও এই অবস্থা। পরিপক্ব বয়সেই আগাথা কৃস্টি ইহধাম ত্যাগ করেন।

দীর্ঘ ৫২ বছর ধরে একনাগারে চলছে তাই প্রথম দিনের অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস কি এখন আছে? অবশ্যই নেই। বিগত অর্ধ শতকেরও বেশি সময়ে ৩৭৪ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই শোতে অভিনয় করে এসেছে কিন্তু এই রদবদলের দরুন এই নাটকের গণআকর্ষণ ও সমর্থন একটুও কমেনি। তা থেকে নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। তাই বিশ্ব রেকর্ড করে গিনেজ ওয়ার্ল্ড বুকে এটা স্থান করে নিয়েছে।

চেয়ারিং ক্রসের গোড়াতেই অর্থাৎ টটেনহাম কোর্ট প্রান্তের কাছাকাছি স্থানেই রয়েছে বিশ্বের এক নামে চেনা বইয়ের দোকান 'ফয়েল্‌স'। এখানে ৭০ লাখেরও বেশি বই রয়েছে তবে নিন্দুকেরা বলে বই আছে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রায় সবাই পার্শ্ববর্তী অন্য একটা বৃহৎ দোকান 'ওয়াটারস্টোন'-এ চলে যায় বই কিনতে। এর পেছনে কিছু ভিত্তি যে আছে তা আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি। অত্যাধুনিক প্রথায় সংরক্ষিত নয় বলে এখানকার এত বই সময়মতো খুঁজেই পাওয়া যায় না। এর একটা কারণ হতে পারে যে, ইংরেজরা রক্ষণশীল তাই চিরাচরিত প্রথায় চলতে পছন্দ করে। অন্য কারণ হতে পারে যে, এ লাইব্রেরিকে কম্পিউটারাইজেশনের আওতায় আনাটা সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। যে কারণ ও যুক্তিতে ব্রিটিশরা তাদের রোড সিস্টেম পরিবর্তন করে না অর্থাৎ Left Hand Drive থেকে Right Hand Drive-এ যায় না, ঠিক সে যুক্তিতেই হয়তো ফয়েল্‌স এখানে রক্ষণশীলতা রক্ষার নামে আধুনিকতার দিকে মন দিচ্ছে না।

রাস্তায় চললে এই বৈচিত্র্যময় ধরণীর কত দৃশ্যই না নজরে পড়ে। দেখলাম ১৯-২০ বছর বয়সের এক তরুণী যাচ্ছে রাস্তা ধরে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাচ্ছে, তাতে তার যেন কোনো উদ্বেগ নেই। যেন আনমনে পথ চলছে। তার ছেঁড়া ট্রাউজারের পায়ের দিকটা প্রায় ৬ ইঞ্চি বেশি লম্বা এবং সম্পূর্ণ ছেঁড়া-ফাড়া। ভেজা পেভমেন্টের ওপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে চলছে নেহাতই অবজ্ঞাভরে। মনে হলো

www.pathagar.com

এককালে বোধ হয় মক্কার সম্ভ্রান্ত কোরেশরা এভাবেই রাস্তায় চলত, যার জন্য আমাদের নবী গুটনির ওপর কাপড়ের ঝুল রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু চোখে দেখা নয়; আমার সামনেই একদিন ম্যাডাম জেনি, জনাব আনসার আলির স্ত্রী তার পুত্রের পোশাকের প্রশংসা এমনভাবে করছিলেন যে এই ড্রেসই বর্তমানে আভিজাত্যের লক্ষণ। জনাব আনসার আলি লন্ডনে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের একজন চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট। বর্তমানে প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন সিলেটিদের মতো হোটেল ব্যবসা আর মূল প্রফেশন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিকে গৌণ স্থান দিয়ে কিছু কিছু ট্যাক্স কনসালট্যান্টের কাজ করেন। জেনির সাথে আমার পরিচয় আমার কন্যা বীথির বান্ধবী হিসেবে এবং লন্ডনে গেলেই তাদের বাসায় আমার যাওয়া হয়। তাদের ছেলে ইংল্যান্ডেই পড়াশোনা করেছে এবং এই ছেলেই সদ্য কিনে আনা নতুন ড্রেসটি দেখাচ্ছিল। ড্রেসটি আর কিছুই নয়, সেই ছেঁড়া-ফাড়া কালচিটে বিবর্ণ ড্রেস। হাঁটুর একটু ওপরে লম্বালম্বি ৬ ইঞ্চি ছেঁড়া ও শুধু এক জায়গায় নয়, অন্তত চার জায়গায় ছেঁড়া এবং সুতো বেরিয়ে রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত পুত্রও গর্ব করে বলছে, 'দেখো মাম! কী সুন্দর একটা ড্রেস কিনে এনছি!' জানতে ইচ্ছে হলো এর দাম কত হবে। জিজ্ঞেস করতে হলো না, সে-ই গর্ব করে বলল, যে এর দাম সাধারণ ট্রাউজারের প্রায় দেড় গুণ। সভ্যতার বিবর্তন না দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন, ঠিক ঠাওর করা গেল না।

আজকাল ফ্যাশন হয়েছে যে একদম ফাটা এবং ছেঁড়া পোশাক পরে গর্ব অনুভব করা। অনেক সময় দেখেছি শুধু ছেঁড়া নয়, তার ওপর বিদঘুটে কালচিটে রং করে নতুন পোশাককে পুরনো বানানোর প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে। গাঁটের পয়সা খরচ করে সদ্য কেনা সুন্দর ড্রেসকে ডাইং করে বিশ্রী ও বিবর্ণ করা হচ্ছে। কখনো কখনো এমন অদ্ভুদ ময়লা দেখা যায় যে আমাদের দেশের ভিক্ষুকরাও পরতে অনীহা প্রকাশ করবে। এসব কিন্তু খুবই দামি। বাজারে বড় বড় আধুনিক ফ্যাশনের দোকানে সম্পূর্ণ সদ্য তৈরি হিসেবেও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

মূল্যবোধের এই বিবর্তন কি একদিনে হয়েছে, না কৃষ্টি ও সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকৃতির সাথে সাথে ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিগত শতাব্দীর নবম দশকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের শেফিল্ড শহরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমার জামাতা ও কন্যা তখন শেফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছিল। তখন একদিন দুপুরে বাজার করতে যেয়ে দেখলাম পথের পাশে রক্ষিত একটা বড় ডাস্টবিনের ভেতরে বসে এক যুবক ঝিমুচ্ছে। এরূপ আরো অনেক তরুণ-তরুণীই সেকালে এভাবে দিন কাটাত। এদের কি থাকার জায়গা নেই? এর

www.pathagar.com

উত্তরে যে জবাব পেলাম তা আরো বিস্ময়কর। এরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এদের বাপ-মায়েদের বড় গাড়ি, বিরাট বাড়ি ও অঢেল সম্পদ ও প্রাচুর্য– সবই রয়েছে কিন্তু বিদ্রোহ করে এরা ঘরে থাকবে না রাস্তায় এভাবে কষ্ট করে থাকবে তবু নিজেদের বাড়িতে থাকবে না। এরাই নিজেদের হিপপি বলে অভিহিত করে। এরা কোনো কাজকর্ম করে না। দিনভর মনে হয় লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে এবং রাতে দু-চারজন এক সাথে মিলে কোন নাইট ক্লাবে কিংবা নাচ ঘরে হামলা চালায়। ড্রাগস খায় এবং এরা এতে কোন লজ্জা অনুভব করে না। তথা কথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এদের নীরব প্রতিবাদ। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে হিপপিদের বেশ বড় একটা গোত্র গড়ে ওঠে। সমাজ ও সংসারের বিরুদ্ধে এদের দারুণ অভিমান এবং ঘৃণা। এরা মনে করে যে তাদেরই পিতা-মাতারা সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে শুধু অন্যায় ভাবে ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার জন্য। এর ফলে দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে এবং এরা মনে করে এটা নিশ্চিতভাবে অন্যায়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করার জন্য না সমাজ, না সরকার, না গির্জাগুলো কিছু করছে। সুতরাং এরা নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কিভাবে? এদের বাপ-মায়ের অগাধ সম্পত্তি আছে, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, আছে স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনযাপনের জন্য আছে প্রচুর অর্থ কিন্তু হিপপিরা মনে করে যে, এ সবই অশান্তির মূল। মুক্তির জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই। বাপ-মায়ের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাদের অন্যায় ভাবে আহরিত সম্পদে এদের লোভ নেই। নিজেদের সুখ-দুঃখের প্রতি এদের খেয়াল নেই। এরা চুল কাটবে না, চুল আঁচড়াবে না, অবাধ যৌনাচারে তারা বিশ্বাসী। মদ ও নেশা এদের নিত্য সাথী, এর মধ্যে তারা নির্মল আনন্দ পায়। এরা ৯টা-৫টা অফিসে বন্দী থাকার ঘোরবিরোধী।

এদের এক নেতা জন লেনন বলতেন, 'এমন ভুবন আমরা তৈরি করব যেখানে বিশ্বের সকল অধিবাসী বিশ্ব ভোগ করবে।' হিপপি হতে চাইলে শান্তিতে বিশ্বাস করতে হবে এবং শান্তি পেতে হলে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই তা অর্জন করতে হবে। তাই তাদের দর্শন হচ্ছে যে ধনী-দরিদ্র , শ্বেত-পীত- কালো যে বর্ণেরই হোক না কেন সকলকে মুক্ত মনে গ্রহণ করে নাও। মনের উদারতার জন্য বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই আজকের সমাজব্যবস্থা, সরকার ব্যবস্থা ও ধর্মীয় ব্যবস্থার কোনো আবেদন তাদের কাছে নেই। বর্তমানের ইউসুফ ইসলাম এবং মুসলিম এইডের নেতা ক্যাট স্টিভেন্স ছিলেন একজন হিপপি।। তাঁর কথা ছিল– 'If you want to be free, be free, because there is a million of things to be done.' ক্যাট স্টিভেন্স অন্য জায়গায় বলেছেন, 'I have

www.pathagar.com

been smiling, lately dreaming about the world as one and I believe it could be– some day it's going to come. (Peace Train)'

সাফট্সবেরি এভিনিউ ধরে দক্ষিণ দিকে চলেছি আর মনে মনে ভাবছি এই অঞ্চলেই একসময় ক্যাট স্টিভেন্স এই হিপপিদের সাথে মাতামাতি করত। শান্তির প্রত্যাশায় পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার ধ্বনি তিনি তোলেন। তারপর একদিন কী হলো, সব ছেড়ে ছুড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং প্রকৃত শান্তির উৎস খুঁজে পান। জনাব ইউসুফ ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ আমার হয়েছিল যখন তিনি ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় এসেছিলেন। তখন তাঁর মাঝে দেখেছিলাম লুক্কায়িত একজন প্রকৃত সুফি সাধক।

www.pathagar.com

ছয়.

ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে

চেয়ারিং ক্রস রোডের দক্ষিণ প্রান্তে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের লাগোয়া দ্য ন্যাশনাল গ্যালারি এবং ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারির চত্বর নজরে এল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই গ্যালারিটি উদ্বোধন করা হয়। এখানে শুধু ইংল্যান্ডের নয় সারা বিশ্বের লেখক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক চিত্রশিল্পীদের প্রস্তুতকৃত চিত্র ও মূর্তি রয়েছে। শুনেছি যে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এখানেই রয়েছে আর্ট ও পেইন্টিংয়ের বৃহত্তম সংগ্রহ। সময়ের অভাবে এর ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না।

পথ ধরে চলছি এবং নানা দৃশ্য অবলোকন করে করে চলছি। পোর্ট্রেট গ্যালারির সন্নিকটে এক চিলতে সবুজ চত্বরে দেখছি কিছুসংখ্যক লোক বেশ আনন্দের সাথেই শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। রেলিংয়ের ধারে এবং পথের ধারের বেঞ্চে বসে নরম পানীয় কিংবা 'পেইল এইল' এক ধরনের টিনবদ্ধ বিয়ারের সদ্ব্যবহার করছে। এরা এসব পান করে কখনো মাতলামি করে না। এদের কথায় একটু গলাটা ভিজিয়ে নেয় মাত্র।

রাস্তায়র ডান পাশে পোর্ট্রেট গ্যালারি রেখে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে এলাম। ট্র্যাফালগার স্কোয়ারটির যতটা নাম ততটা বড় কিন্তু এটা নয়। তবে বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে ১৮৫ ফিট উঁচু বিরাট একটি স্তম্ভ রয়েছে, যার শীর্ষে ১৭ ফিট উঁচু লর্ড নেলসনের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভটির ভিত্তি বেশ সুপরিসর এবং এর চার কোণে ব্রোঞ্জনির্মিত চারটি সিংহ পাহারারত অবস্থায় রয়েছে। লর্ড নেলসনই তৎকালীন দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে ট্র্যাফালগার নৌযুদ্ধে পরাস্ত করে ইংরেজদের মান ও অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন

www.pathagar.com

এবং নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড বিজয়ের আশা চিরতরে নির্বাপিত করে দিয়েছিলেন। এই বীরের সম্মানার্থে শুধু এই স্কোয়ারেই নয়, টেমস নদীর ধারে ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্টে ক্লিওপেট্রার নিড্‌ল স্থাপন করে ইংরেজরা লর্ড নেলসনের বিজয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিল।

মাইলখানেক হেঁটে এসেছি। একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য সিঁড়িতে এসে বসলাম। ট্যুরিস্ট হওয়ার মজাই এটা। আপনি কে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একজন অতি সাধারণ পথিক বনে যাবেন। আপনার পদমর্যাদা, কী করণীয় কিংবা করণীয় নয় ইত্যাদি মামুলি বিষয় নিয়ে ভাবার মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যাবে। তখনই সত্যিকার অর্থে আপনি মুক্ত হয়ে যান এবং সামাজিক আচার-আচরণের বেড়ি আপনাকে আর ধরে রাখতে পারে না। অবাধ মন নিয়ে আপনি তখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে পারেন। বেশ মনে পড়ে– আমার বেগম সাহেবা এবং আমি যখন পর্যটকসুলভ মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন দেশের শহরের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতাম তখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেই কোথাও কোনো সিঁড়িতে কিংবা বেঞ্চে বসে পড়তাম। থলে থেকে বিস্কুট কিংবা চকলেট, বিশেষ করে কিটক্যাট (যা আমার গৃহিণীর সেই সুবাদে আমারও প্রিয় চকলেট) মোড়ক খুলে দুজনে মিলে ভাগ করে খেতাম। সেই স্বাদ ও সেই আমেজই আলাদা। সম্পূর্ণ পর্যটকের ভরঘুরে মনোবৃত্তি নিয়ে প্রিয়তমাকে নিয়ে পথে নামেন, দেখবেন সব কিছুরই রূপ-রস আলাদা হয়ে গেছে। একদিন বেশ মনে পড়ে রাস্তার ধারে রোমের এক চার্চের প্রশস্ত সিঁড়িতে এভাবে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি তখন পথ চলার ক্লান্তিতে নিদ্রায় চোখ বুজে আসতে থাকল– মাথাটা গৃহিণীর কোলে রেখে বোধ হয় দু মিনিটের মধ্যেই পূর্ণ নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লাম। একটু পরই কিছুসংখ্যক লোকের কথাবার্তায় নিদ্রা টুটে গেল এবং লক্ষ করলাম চার্চেরই এক পাদ্রি এবং আরো কিছু পথচারী আমাকে অসুস্থ ভেবে আমার গৃহিণীকে এবং আমাকে কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি উঠে বসলাম এবং এতে তাদের ভ্রান্তি দূর হলো যে আমি মোটেই অসুস্থ নই।

লোকজন চলে গেলে আমি গৃহিণীর কাছে জানতে চাইলাম– কী হয়েছিল। তিনি সংক্ষেপে বললেন, ভাষার বিভ্রান্তি। ইটালিতে পাদ্রিটি তড়বড়িয়ে বেগম সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং বেগম সাহেব তার একটা অক্ষরও না বুঝে ইংরেজিতে কিছু বলতে চাইছিলেন এবং তিনি বুঝে নিলেন যে ভদ্র মহিলা বিপদগ্রস্ত। ইতোমধ্যে দু চারজন পথচারীও ঘটনার স্বাদ গ্রহণের জন্য সমবেত হয়েছিলো এবং তাদের সমবেত কথোপকথনের আওয়াজেই আমার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছিল।

www.pathagar.com

ভাষা বিভ্রাটের আর একটা ঘটনার উল্লেখ না করে এগোতে চাচ্ছি না। ১৯৬১ সন। করাচির কালাপুল অঞ্চলে ১৪ নম্বর এয়ারফর্স হাউসে সস্ত্রীক বসবাস করছি। সুখের সংসার। দুই কন্যা বীথি ও দীপ্তির বয়স যথাক্রমে ৫ ও ৩ বছর। করাচির আবহাওয়ার বিশেষত্ব হলো যে মে, জুন ও জুলাই মাসে সমস্ত অঞ্চলটা মরুভূমির মতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সারা দিন ধরেই বিশেষ করে দুপুরের দিকে ছোট ছোট ধূলির ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ঘরের মেঝে এবং আসবাবপত্রে মিহিন বালির স্তর জমে যায়। ঘরের মেঝে প্রতি দিনই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ঝাড়ু দিতে হয় এবং পানি দিয়ে মেঝে মুছতে হয়। তখন ঘরটা শীতল হয় এবং আর্দ্রতাও ফিরে আসে। সে সময় আমি ড্রিগ রোডে অবস্থিত কারসাজ নামের একটা নেভাল এস্টাবলিশমেন্টে ট্রেনিং কমান্ডারের কাজ করছিলাম। আমাদের অফিস সময় ছিল বেলা ৭টা থেকে ২টা পর্যন্ত। এক মাকরান বুড়ি আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করত। অফিস থেকে আমি ৩টার দিকে ফিরে প্রায়ই দেখতে পেতাম যে, ঘর যেন-তেন প্রকারে ঝাড়ু দেয়া হয়েছে কিন্তু পানি দিয়ে মোছা হয়নি; তাই সেই সুশীতল পরশটা পেতাম না এবং ঘরের আবহাওয়া রুক্ষ ও শুষ্ক মনে হতো। একদিন আমি বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করলাম ঘর মোছা হচ্ছে না কেন? জবাবে তিনি বললেন যে, মাকরানি বুড়ি সকাল ৯টার দিকে এসেই কাজ করে চলে যায়। তাই দুপুরের ঘূর্ণিঝড়ের বালু এবং উত্তাপ থেকেই যায়। মাকরানি বুড়ির সাথে আমার একদিন দেখা হলো এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, সে দুপুরে ঘর মোছার কাজে আসে না কেন? সে বলল 'সাব জি ম্যায় তো দোপহরকোই আনা চাহতি থি– লেকিন মেম সাব তো দোপহরকো ঘুমনেকে লিয়ে যাতি হ্যায়। ইস লিয়ে ম্যায় সুবহা সুবহা কাম খতম কর দেতি হো।' অর্থাৎ সাহেব, আমি তো দুপুরেই কাজ করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু বেগম সাহেব দুপুরে বাইরে ঘুরতে যান, তাই আমি সকাল সকাল এসে কাজ করে দিয়ে যাই। আমার মনে খটকা লাগল- দুপুরে প্রতিদিন বেগম, সাহেব কোথায় ঘুরতে যান, কেনই বা যান অথচ আমি কিছুই জানি না। এ কেমন ধারা কথা। তাই আমি বেগম সাহেবাকেই অভিযোগের সুরে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় তিনি প্রতিদিন দুপুরে ঘুরতে যান। জবাবে তিনি বললেন, তিনি কোথাও যান না। তবে তিনি দুপুরে ঘুমুতে যান, তাই সে সময়টা ঘর ধোয়া-মোছা করলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে তিনি বুড়িকে একটু আগে এসে কাজ করে যেতে বলেছেন। এবারে আমি বুঝলাম যে বেগম সাহেবা তাঁর সদ্য আহরিত উর্দু ভাষায় বুড়িকে বলেছেন, যে তিনি 'দুপুর মে ঘুমনে যাতা হ্যায়' অর্থাৎ ঘুমুতে যান আর বুড়ি ভেবেছে ঘুমনে

www.pathagar.com

যাওয়া মানে বাইরে ঘুরতে যাওয়া। বাংলা-উর্দুর ভাষা বিভ্রাট।

ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে ফিরে আসি।

নেলসনকে ঘিরেই ট্র্যাফালগার স্কোয়ার। নিজেও নাবিক তাই নেলসনের মতো নাবিকের কাহিনী অব্যক্ত রেখে এগিয়ে যাওয়াটা মোটেই সমীচীন মনে হবে না। নৌযুদ্ধের ইতিহাসে এই যোদ্ধার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মাত্র ১২ বছর বয়সেই নেলসন তাঁর নাবিকজীবন শুরু করেন। দেখতে ছোটখাট ও দুর্বল মনে হলেও সাহসিকতার দিক থেকে তিনি ছিলেন অসাধারণ। নৌযুদ্ধে তিনি নতুন নতুন কৌশল ও আক্রমণাত্মক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতেন। তিনি যখন এইচএমএস ভ্যানগার্ড জাহাজের ক্যাপটেন তখন তিনি ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌবহরকে তাড়া করে মিসর পর্যন্ত নিয়ে যান এবং সেখানে নীলনদের যুদ্ধে সমগ্র ফরাসি নৌবহরকে বিধ্বস্ত করে দেন। নীলনদের যুদ্ধে বিজয়েরর জন্যই তাঁকে ক্লিওপেট্রার নিড্‌ল উপহারস্বরূপ দেয়া হয়, যা বর্তমানে টেমস নদীর তীরে ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্টে স্থাপন করা হয়েছে।

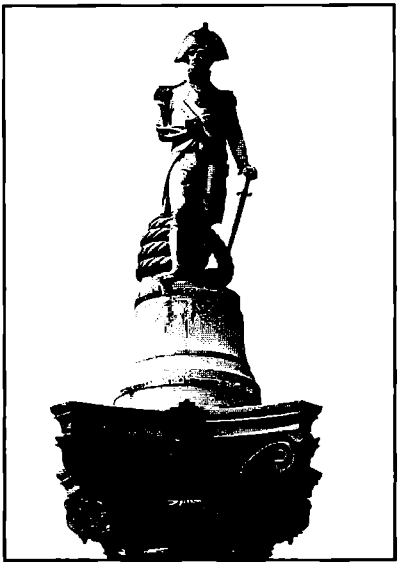

নেলসন কলাম। সর্বোপরে নেলসনের মূর্তি

নীলনদ যুদ্ধের বিজয়ের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ইটালির নেপল্‌সে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যামিলটনের গৃহে

www.pathagar.com

অবস্থান করতে থাকেন। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী এমা তখন সেবাযত্ন দিয়ে লর্ড নেলসনকে সারিয়ে তোলেন। লেডি হ্যামিলটন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা ছিলেন। সেবাশুশ্রূষা দেয়ার সময় লর্ড নেলসন ও এমা একে অপরের প্রতি ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে এই অবৈধ প্রেম আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির রূপ নেয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য বিজয়ী বীর লর্ড নেলসন অ্যাডমিরালটির বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন এবং লর্ড নেলসনকে দূরে রাখার জন্য পুনরায় সমুদ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। যোদ্ধা নেলসন বাল্টিক সাগরে ডেনিস নৌবাহিনীকে পরাভূত করেন এবং সমগ্র সাগর এলাকায় ব্রিটিশ নৌ প্রাধান্য গড়ে তোলেন। লর্ড হোরাসিও নেলসনকে তখন অ্যাডমিরালটি এইচএমএস ভিক্টরি জাহাজের ক্যাপটেন পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং সমগ্র এলাকার সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে পদোন্নতি দেন।

এই সময় ফরাসি দেশের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সমগ্র ইউরোপ তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। নৌক্ষেত্রেও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তিনি নৌবাহিনী সম্প্রসারণের ব্যাপারেও মনোযোগ দেন এবং নৌযুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনি স্পেনের সাথেও আঁতাত গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে নৌযুদ্ধের সময় স্পেন ও ফ্রান্স যৌথভাবে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে। নেপোলিয়নের আগ্রাসনের মনোভাবের সত্যিকারের রূপ পায় ১৮০৫ সালের ২১ অক্টোবর। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে ব্রাইটন বন্দর থেকে ব্রিটিশ রণতরী নৌযুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয় এবং ফরাসি ও স্পেনের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়। অত বড় নৌবহর নিয়ে এর আগে কখনো যুদ্ধ হয়নি। সম্মিলিত বাহিনী আকারে বড় এবং অধিক শক্তিশালী হয়েও অ্যাডমিরাল নেলসনের যুদ্ধ কৌশলের দরুন পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। উন্মুক্ত সাগরে ফরাসি এবং স্পেনের সম্মিলিত বাহিনীকে ব্রিটিশ বাহিনী দ্বিখণ্ডিত ও ত্রিখণ্ডিত করে ফেলে এবং ছোট ছোট টুকরো নৌবহরকে ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটিশদের আক্রমণ ছিল অনেকটা নেকড়ে বাঘের আক্রমণের মতো। শত্রুকে দিশেহারা করে দেয়া এবং খণ্ড খণ্ড বাহিনীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়া।

এই যুদ্ধের পরিণতি এমন হয়েছিল যে ফরাসিরা শুধু একটা যুদ্ধে হারেনি বরং পরবর্তী ১০০ বছরের জন্য সমুদ্রে ব্রিটিশদের আধিপত্য স্থাপন করে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কৃপার ওপর নির্ভর করতে হতো ইউরোপের দেশগুলোকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি যা হলো তার ধাক্কা আর সামাল দিয়ে উঠতে পারল না ১৮১২ সালে রাশিয়ার কাছে পরাজয় এবং

www.pathagar.com

১৮১৫ সালে ব্রাসেলসের কাছে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ফরাসিদের প্রাধান্য বিস্তারের আশা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়।

নেলসনের জয় হলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু একদিকে এই জয় অন্য দিকে একই সময়ে সাগরে তাঁরই জাহাজ এইচএমএস ভিক্টরিতে একটি গুলির আঘাতে নেলসনের মৃত্যু হরিষে বিষাদের মতো সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে সমাচ্ছন্ন করে তুলল।

সেই নেলসনের মূর্তির ১৬৫ ফিট নিচে বসে এসবই ভাবছি। এই বীর নিজের জীবন দিয়ে ব্রিটিশ পতাকাকে সমুন্নত রাখলেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তার প্রেয়সী এমা এবং কন্যা হোরাসিয়ার জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলেন না। ব্রিটিশ সরকারও এই অবৈধ প্রেমকে কখনো স্বীকার করেনি বলে নেলসনের শেষ অনুরোধ রক্ষার্থে এমা ও হোরাসিয়াকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এমাকে একপ্রকার ভিক্ষা করেই জীবন চালাতে হয়েছিল। নেলসনের বীরগাথায় তার প্রেয়সী ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড হ্যামিলটনের স্ত্রী এমার অবদান কি অস্বীকার করা যায়? কবি নজরুলের ভাষায়–

'দিবসে দিয়েছে শক্তি সাহস, নিশীথে হয়েছে বঁধু,
পুরুষ এসেছে মরু তৃষা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু।'

সেই রূপকথার নারীর স্থলে কি এমাকে বসানো যেত না ? যেত কিন্তু তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজ এমার অবদান গ্রাহ্যই করল না। শুধু তাই নয় তাকে ধিকৃত করে তাঁকে এবং তাঁর কন্যাকে ভিক্ষার ডালি হাতে নিতে বাধ্য করল। তাই বোধ হয় কবি নজরুল অন্যত্র লিখেছেন–

'কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি,' কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতির স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।'

এই নারী কি সেই নারী ছিলেন না যিনি নীল নদের যুদ্ধের পর, সেবা-যত্ন দিয়ে বীর লর্ড নেলসনকে সারিয়ে তুলেছিলেন? তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

ইতিহাসচর্চা অনেক হলো, এবার উঠতে হয়। মনে হচ্ছিল যে, পথ চলতে চলতে পথের পাশের ইতিহাসে আমি মিশে গেছি। তাই আমার মনের ভাবের কিছুটা অংশ সুধী পাঠকের নিকট তুলে ধরলাম। নেলসন কলামটির কথা মনে এলেই এর পেছনের সেই তেজস্বী বীর নেলসনের স্মৃতিকথা মনে উদয় হয়, তাই হয়েছে বলেই অত কথা বললাম।

আর নয়। বেলা ৩টা। এখানেই বলে রাখি যে, ট্রাফালগার স্কোয়ারে হাজার হাজার কবুতর এবং আপনাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে, নইলে হয়ত দু-চারটা কবুতর আপনার পায়ের নিচে পড়ে মরবে। কবুতরের ঝাঁক ডিঙিয়ে ট্রাফালগার স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত অ্যাডমিরালটি আর্চের দিক দিয়ে বেরোলাম। সামনে আলীশান গেট। এটাই অ্যাডমিরালটি আর্চ। সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁর মাতা রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখার জন্য এই আর্চটি নির্মাণ করান। একদম ওপরে ল্যাটিনে লিখা আছে, "*ANNO DECIMO EDWARDI SEPTIMI REGIS VICTORIÆ REGINÆ CIVES GRATISSIMI MDCCCCX*"

যার অর্থ হচ্ছে 'নগরবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯১০ সালে।' গেটের ওপারে কী আছে তা দেখার জন্য পা বাড়ালাম।

www.pathagar.com

সাত.

সেন্ট জেমস পার্কে

অ্যাডমিরালটি আর্চের দিক দিয়ে বেরোলাম। সামনে আলীশান গেট। অ্যাডমিরালটি আর্চ নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বক্রাকার এই তোরণটি সমগ্র অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তোরণ অতিক্রম করলেই সামনে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত যে সুপ্রশস্ত রাস্তাটি গেট থেকে শুরু করে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত চলে গেছে তাকেই বলা হয় 'দ্য মল'। গেট থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা দূরে গেলেই বাম দিকে থাকবে রয়েল নেভি স্থাপনা। এ থেকেই অ্যাডমিরালটি আর্চের নামটি হয়েছে।

অ্যাডমিরালটি আর্চ ও তৎসংলগ্ন সংস্থিতিসমূহ বর্তমানে অ্যাডমিরালটির এবং কমনওয়েলথের অফিস হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যাডমিরালটি আর্চ থেকে সোজা বরাবর প্রায় আধা মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বাকিংহাম প্রাসাদ এবং দু ধারের বনাঞ্চল এক সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করে। এই মনোজ্ঞ দৃশ্য দেখে দেখে বড় রাস্তার পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তায় হাঁটতে বেশ আনন্দই লাগে। সেন্ট জেমস পার্কের আধাআধি পথ অতিক্রম করলে রাস্তার উত্তর পাশে থাকবে সেন্ট জেমস প্যালেস। হর্স গার্ড প্যারেড গ্রাউন্ড যেখানে প্রতি বছর রানীর জন্ম দিনে রানীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ঘোড়ার কুচকাওয়াজ হয় এবং এই উপলক্ষে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তার অবস্থান হচ্ছে সেন্ট জেমস পার্কের পূর্ব দিকে।

মনে পড়ে আমি যখন লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশনে ডেপুটি নেভাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম তখন ১৯৫৯ সালের জুন মাসে এই মনোজ্ঞ

www.pathagar.com

কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি ও আমার বেগম সাহেবা।

দ্য মল হয়ে চলতে থাকলে একটু গিয়ে বাম দিকে দেখতে পেলাম হর্স গার্ড গ্রাউন্ড এবং ডান দিকে সেন্ট জেমস প্যালেস। ধীর গতিতে অগ্রসর হলাম সেন্ট জেমস পার্কের দিকে। মন মাতানো সুন্দর পটভূমিতে সেন্ট জেমস পার্ক। বীথি ও দীপ্তিকে নিয়ে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল অবধি সময়ে প্রায়ই আসতাম বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্য। কতবার যে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই। বীথি ও দীপ্তির বয়স তখন ছিল তিন-চার। তাই এই পার্কের চিলড্রেন্স কর্নারে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করত। বেশ মনে পড়ে 'সি সতে' উঠতেই বীথির কেন যেন ভীষণ ভয় লাগত। ছোট বোন দীপ্তি উঠুক এবং একবার ওপরে ও একবার নিচে নামুক এটা দেখেই বীথির আনন্দ।

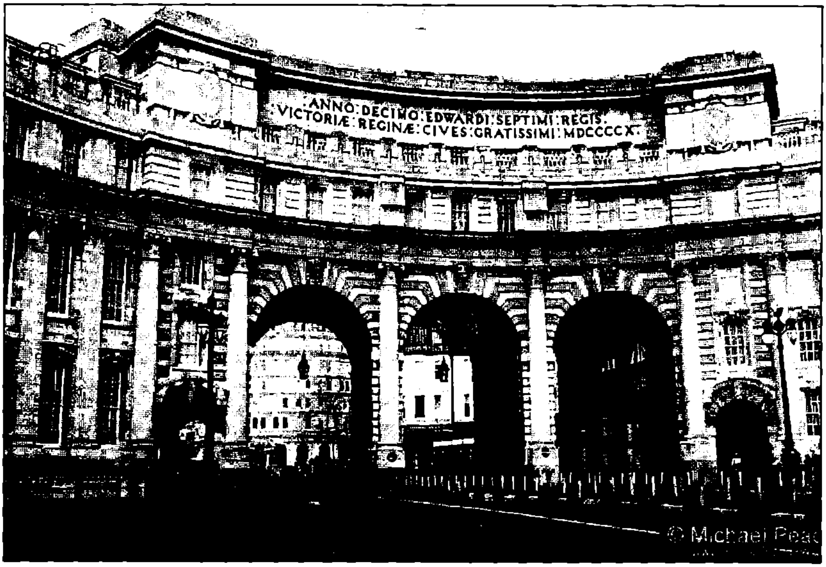

অ্যাডমিরালটি আর্চ

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পর সেন্ট জেমস পার্কে এলাম এবং হ্রদের ধারেই একটা বেঞ্চে বসলাম। পুরনো স্মৃতি এসে ভিড় করল। এখনো দেখছি হ্রদটি আগের মতোই আছে। নানা জাতের হাঁস এবং দ্বীপে নানা জাতের পাখি অবাধে চলাফেরা করছে। কেউই এদের বিরক্তও করছে না কিংবা ভয়ও দেখাচ্ছে না। এরাও তাই নির্ভয়ে বিচরণ করছে। দর্শকরা বসে থাকলে একদম কাছে এসে মনে হয় কিছু চায়। এরাই প্রকৃত স্বাধীন। এরা স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতে পারে, স্বাধীন ভাবে

www.pathagar.com

বসে থাকতে পারছে এবং ইচ্ছে হলে স্বাধীনভাবে উড়ে চলেও যেতে পারে; কিন্তু স্বাধীনভাবে এখানে থাকতেই বেশি পছন্দ করছে। কোথাও যেতে চায় না তার মূল কারণ হলো, তারা এখানে থাকাটা নিরাপদ মনে করে এবং তারা তাদের মূল চাহিদা আহার্য স্বচ্ছন্দে পেয়ে যায় বলে কোথাও চলে যাওয়ার চিন্তাও করে না। বাংলাদেশীদের নিজের দেশে থাকার স্বাধীনতা আছে সত্য কিন্তু তবু তারা পারলেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়, তার অন্যতম কারণ আহার ও বাসস্থানের নিরাপত্তার অভাব। পাখিদের যেমন আহার ও বাসস্থানের চাহিদা পূর্ণ হলেই তারা নির্দ্বিধায় ও নিশ্চিন্তে এক স্থানে অবস্থান করতে পারে, মানুষের বেলায় সেটা হওয়ার নয় কারণ তাদের চাহিদা সীমাহীন এবং প্রায় অপূরণীয়। তাই নিত্য নতুনের সন্ধানে তারা দেশ-বিদেশের উদ্দেশে ছুটে চলে। এখানে বসে বসে মনে হলো বাংলাদেশীদের মধ্যে যাদের খাওয়া-পরার সুবন্দোবস্ত আছে তারাও চলে যেতে চায় কেন? মনে হলো যে মানুষ তো আর পাখি নয় যে তাদের মূল চাহিদা খাওয়া এবং নিরাপদ বাসস্থান পেলেই তারা সন্তুষ্ট হবে। মানুষের আরো কত কিছুর প্রয়োজন? মান, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সর্বোপরি আইনের শাসনের মধ্যে থেকে স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপদ অনুভব করা। বহুদিন আগে আমার এক বন্ধু মরহুম আনিসুল ইসলাম বাংলাদেশ সার্ভে অরগানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা একবার নব্বই দশকের দিকে তার সিঙ্গাপুর সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সেখানে তিনি এক শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলেন যে, শিখ ড্রাইভারটির বাড়ি দিল্লিতে এবং প্রতি দু বছর পরপরই ড্রাইভারটি দিল্লিতে যায় জন্ম ভূমি এবং অত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখাশোনা করতে। দেশকে না দেখলে নাকি তার ভালোই লাগে না। তাহলে দেশে থেকেই তো সে তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। উত্তরে সে বলেছিল, দেশ ভালো তবে সেখানে বিচারই নেই। ন্যায়বিচার তো দূরের কথা। সিঙ্গাপুরে অন্যায় করলে লি কোয়ান ইউ (সিঙ্গাপুরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)-এর যে শাস্তি হবে সে একজন নিছক ড্রাইভার তারও একই সাজা হবে। আইনের চোখে প্রত্যেক নাগরিকই সমান। ভারতে কি তা হয়? হয় না। ভারতে গিয়ে সে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে। আইন তার জায়গায় থাকবে এবং আইনের ফায়দা লুটবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগকিরা এবং আইনের গেঁড়াকলে পড়ে নিষ্পেষিত হবে তাদের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকরা। শুধু এ ধারণাই দেশের প্রতি মমত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও দেশ তাকে টেনে দেশে নিয়ে যেতে পারছে না। পাখিদের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই, নেই বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা। দূরে কী সুবিধা কিংবা অসুবিধা থাকতে পারে তা পাখিরা জানতে পারে না এবং জানতে চায়ও

www.pathagar.com

না। তাই তারা অন্য কোথাও যায় না? যে স্থানে তারা অবস্থান করছে সে স্থানটা যদি বাসোপযোগী না হয় তাহলেই শুধু তারা migrate অর্থাৎ দলবলসহ অন্যত্র চলে যায়। মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ বলে জানতে পারে অন্য স্থানে কী প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকতে পারে। তা বিচার-বিবেচনায় যেখানে ভালো ঠেকে সেখানেই চলে যেতে চায়। আর এই মনোভাবকে প্রতিহত করার জন্যেই পাসপোর্ট-ভিসার বিধিব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি পাখিগুলো অল্প সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য উড়ে অন্যত্র চলে যেত তাহলে; কিন্তু এগুলোর পায়েও শেকল লাগাতে হতো কিংবা খাঁচায় বন্দী করে রাখা হতো। এই হচ্ছে জীবন। প্রত্যেকেরই কিছু বাধ্যবাধকতা আছে এবং তার মধ্যেই তাকে স্বাধীনভাবে থাকার প্রচেষ্টা করতে হয়।

সেন্ট জেইমস পার্কের হ্রদের পারে বসেই ভাবছি এ অঞ্চলের ইতিহাস। রাজা

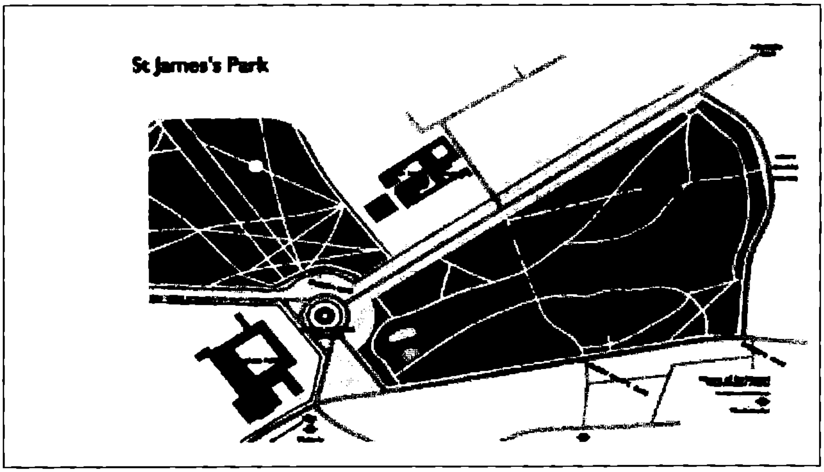

সেন্ট জেমস পার্ক

অষ্টম হেনরি এই পার্কটির জন্য ১৫৩১ একর জায়গা নির্বাচন করেন। রাজা প্রথম জেইমস ১৫৬৩ সালে ফরাসি পদ্ধতির অনুকরণে প্রস্তাবিত এই পার্কের একটা নকশা তৈরি করান। ১৫৬৭ সালে বিভিন্ন জাতের পাখি এখানে আনানো হয়। ১৫৭৩ সালে বাকিংহাম হাউস নির্মাণ করা হয় যা পরবর্তীকালে বাকিংহাম প্রাসাদে রূপান্তরিত করা হয় এবং রাজা-রানীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯০৫ সালে কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেন নির্মাণ করা হয় এবং বাগানে কুইন ভিক্টোরিয়ার এক মূর্তি স্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

শত শত বছর ধরে রাজা-রাজড়াদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই মনোরম উদ্যান। ঐতিহাসিকদের মতে, এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটা ছিল অব্যবহারযোগ্য জলাভূমি। আলোর পাশেই আঁধারের মতো একদিকে প্রাসাদ ও মনোরম উদ্যান তৈরি হচ্ছিল, অন্যদিকে গড়ে উঠছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বারবণিতাদের ব্যবসা কেন্দ্র। ভিক্টোরিয়ান আমলে এখানে (সোহো থেকে শুরু করে হাইড পার্ক এবং গ্রিন পার্ক এলাকা) নাকি প্রায় ৮০,০০০ প্রস্টিটিউট জমিয়ে ব্যবসা করত। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন পড়াশোনা করার জন্যে লন্ডনে গিয়েছিলাম, তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহপাঠী ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুর ও পাইলট অফিসার মাহবুবুর রহমানসহ কখনো কখনো বারবণিতাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার জন্য হাইড পার্কে যেতাম। কুড়ি থেকে বুড়ি পর্যন্ত এই বারবণিতারা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাছে ভিড়ত এবং আমাদের সাথে দরকষাকষি করত। সেকালে সাইজ, সেইপ, বয়স ও সৌন্দর্যভেদে ১০ শিলিং থেকে শুরু করে ৫ পাউন্ড পর্যন্ত চার্জ করা হতো। সেই যুগ থেকে এখন বারবণিতাদের ব্যবসা আরো উন্নত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী আরো অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অভিজাত এলাকায় অতি সম্ভ্রমের সাথে ব্যবসা করে যাচ্ছে এবং তাদের খপ্পরে পড়ে অনেক নেতা তাদের মান-ইজ্জত হারিয়েছেন তার খবর বেরোয় অনেক ট্যাবলয়েড পত্রিকায়। এখন বারবণিতারা আর গোপনে গোপনে ব্যবসা করছে না। এরা এখন যৌনকর্মীর কিংবা যৌনশিল্পীর মর্যাদা পাচ্ছে। যুগের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী ন্যায়, নীতি ও মানবাধিকারের রূপরেখাও যে বদলিয়েছে তার উদাহরণ আমরা এখানেও দেখতে পাই।

২১ এপ্রিল ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের রানীর জন্ম। সময়টা শীত ও বসন্তের সন্ধিক্ষণে বলে আবহাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তাই জাঁকজমকভাবে রানীর জন্মদিন পালনের উদ্দেশে ইংরেজরা একটি সম্ভাবনাময় রৌদ্রোজ্জ্বল দিন জুনের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারণ করে থাকে। এই দিনেই রানীর আনুষ্ঠানিক জন্মদিন পালন করা হয়। এই দিনে বর্ণাঢ্য সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে রাজপরিবার রাজকীয় মর্যাদায় ঘোড়ার গাড়ির বহরে শোভাযাত্রা করে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে মল হয়ে মলের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রবেশ করে এবং ধীর গতিতে এক চক্কর দিয়ে পুনরায় মল হয়ে বাকিংহাম প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে যায়। এই শোভা যাত্রায় রানীর গৃহরক্ষী পদাতিক ডিভিশন, রানীর অশ্বারোহী ডিভিশন শামিল থাকে। তারা অত্যন্ত জমকালো ও চাকচিক্যময় পোশাক পরিধান করে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

www.pathagar.com

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ জুন ছিল রানীর আনুষ্ঠানিক জন্মদিন এবং এই দিনে আমি ও আমার গৃহিণী এই শোভাযাত্রা পরিদর্শন করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আকাশ ছিল পরিষ্কার এবং রৌদ্রোজ্জ্বল কিন্তু বাতাস বইছিল বলে ঠাণ্ডা ছিল কনকনে। প্যারেড দেখতে বড়জোর আধাঘণ্টা লেগেছিল কিন্তু সেজেগুজে যথাসময়ে ঘর থেকে বের হওয়া, সময়মতো সিটে উপবেশন করা এবং প্যারেড শেষে যথারীতি ভদ্রোচিতভাবে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল লাইন ধরে প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বের হওয়া ইত্যাদিতে সময় লেগেছিল প্রায় ৩ ঘণ্টা। তবে উপভোগ্য ছিল বলে আজও মনে সুখস্মৃতি বয়ে আনে।

আমার সামনেই কিছুটা দূরে দেখতে পাচ্ছি হর্স প্যারেড গ্রাউন্ড এবং এখানেই শোভাযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মলের উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ সেন্ট জেমস প্যালেসের বর্ণনা না দিলে ইংল্যান্ডের ইতিহাস অসিদ্ধ থাকবে। ১৫৩৬ সালে অষ্টম হেনরি কর্তৃক নির্মিত এই প্রাসাদটি পরবর্তী প্রায় ৩০০ বছর ছিল ইংল্যান্ডের রাজা ও রানীদের বাসস্থান। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এই প্রাসাদটিতে আগুন লেগে যায় এবং প্রভূত ক্ষতি হয় । এরপর পুনরায় এর সংস্কারসাধন করা হয় এবং চতুর্থ উইলিয়াম এ প্রাসাদেই বসবাস করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর এই প্রসাদে শুধু কোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই অব্যাহত থাকে।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়া সদ্যনির্মিত বাকিংহাম প্রাসাদে তার বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। সিংহাসন আরোহণের তিন সপ্তাহের মধ্যেই সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বাকিংহাম প্রাসাদে বসবাসের জন্য আসেন। তখনো কিন্তু বাকিংহাম প্রাসাদ সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়নি। এটা ছিল প্রথমে টাউন হল, যা ডিউক অব বাকিংহাম, রানী অ্যানের বন্ধু জন শেফিল্ড নির্মাণ করেছিলেন। রানী অ্যান গ্রিন পার্ক এবং জেমস পার্কের সঙ্গমস্থলে এক কোণে ৪ বর্গ একর জমি দান করেন এবং এই স্থানেই ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে বাকিংহাম ভবন নির্মাণ করা হয়। এই সম্পূর্ণ এলাকা ছিল কণ্টকময় এবং গুল্মলতাজাতীয় ঘাসে আবৃত। ১৭৬২ সালে রাজা তৃতীয় জর্জ লন্ডনে বসবাসের জন্য এই বাড়িটি পছন্দ করেন এবং মাত্র ২৮,০০০ পাউন্ডের বিনিময়ে খরিদ করে নেন। অতপর তিনি তাঁর স্ত্রী রানী সালোটাকে প্রীতি উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এই হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদের আদি ইতিহাস।

তারপর বহু দিন গত হয় এবং আমরা দেখতে পাই ১৮২০ সালে রাজা চতুর্থ জর্জ এটাকে প্রাসাদে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন ভবনটিকে প্রাসাদে রূপান্তরের জন্য মোট খরচ করা হয়েছিল মাত্র ১,৪০,০০০ পাউন্ড। ন্যাস

www.pathagar.com

নামে এক আর্কিটেক্ট এই সংস্কারকাজ হাতে নেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তখন এত টাকা ব্যয়ে এই প্রাসাদ সংস্কারের কাজে সমর্থন দেয়নি। রাজতন্ত্র চলছে তাই বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও প্রসাদ তৈরি হয়েই গেল। ন্যাসের এই প্রাসাদ সেই যুগে বিশ্বের সর্বসেরা প্রাসাদে রূপ নিল। সেই যুগের লাল সিল্ক রাজকীয় ভোজন কক্ষ, সাদা রাজকীয় অভ্যর্থনা কক্ষ, নীল ড্রইং রুম এবং সিংহাসন কক্ষ এ যুগেও মনে হয় যুগোপযোগী প্রশংসিত। সব মিলিয়ে এই প্রাসাদ অত্যন্ত চমৎকার।

চতুর্থ জর্জের পর উইলিয়ম ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি এই প্রাসাদকে মোটেই পছন্দ করলেন না। তত দিনে ধীরে ধীরে বহুবিধ সংস্কারের কারণে এই প্রাসাদের খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭ লাখ পাউন্ডে। রানী ভিক্টোরিয়া কিন্তু এই প্রাসাদের প্রেমে পড়ে গেলেন এবং রানী হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি এবং তার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট এই প্রাসাদকে বাসস্থান ও কর্মস্থল হিসেবে নির্বাচন করেন এবং প্রাসাদের চারদিকে বাগান ও অন্যান্য সংযোজনের মাধ্যমে এক অনুপম প্রাসাদে রূপান্তর করে ফেলেন। তিনি রাজকীয় ভোজসভার জন্য ভোজন কক্ষ নির্মাণ করেন, যা ছিল ১২২ ফিট লম্বা, ৬০ ফিট প্রশস্ত এবং উচ্চতা ৪৫ ফিট। এই প্রাসাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১১ সালে সামনের প্রধান ফটকগুলো ব্রোঞ্জ দিয়ে নির্মাণ করান এবং রাজকীয় অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য এবং বিভিন্ন কাজের জন্য ৬০০-এরও অধিক কামরা নির্মাণ করান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৫২টি রাজকীয় সুইট (কক্ষগুচ্ছ) অন্যান্য অতিথির জন্য ১৮৮টি স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ এবং তা ছাড়া আরাম আয়েশের জন্য বহুবিধ কক্ষ। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাসাদ বানানো হলো লন্ডনে এবং এর সামনে নির্মাণ করা হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেন এবং তার মাঝখানে রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি। ডানদিকে নির্মিত হলো সেন্ট জেমস পার্ক এবং বাম দিকে তৈরি করা হলো গ্রিন পার্ক। বিশাল এলাকা নিয়ে এবং অতি মনোহর পরিবেশে বর্তমানে বাকিংহাম প্রাসাদ অবস্থান করছে।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন গৃহিণীসমেত সুইডেনে গিয়েছিলাম তখন সেখানে শুনেছিলাম যে কুংলিগাস্লাটেট রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর বৃহত্তম এবং ওখানে ৬০৮টি কক্ষ রয়েছে এবং বাকিংহাম প্রাসাদে রয়েছে ৬০৭টি। সে যা-ই হোক অবস্থান বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য বিচারে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ কুংলিগাস্লাটেট থেকে অনেক আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। দুটো প্রাসাদই আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাই আমার বিচারে বাকিংহাম প্রাসাদ অধিকতর মর্যাদার দাবিদার।

www.pathagar.com

আট.
বাকিংহাম প্যালেস

সেন্ট জেমস পার্কের লেকের ওপর অতি সুন্দর ও সজ্জিত সেতুটি পার হয়ে আমি মলে এলাম এবং বাকিংহাম প্রাসাদের দিকেই রওনা হলাম। মল পার হয়ে গ্রিন পার্কের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালসহ বাকিংহাম প্রাসাদের পূর্ণ চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠল এবং সেই সাথে মন চলে গেল এর পেছনের ইতিহাসের সন্ধানে।

১৮৩৭ সাল থেকে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদটি রাজারানীর বাসভবন হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যদিও এটা রানীর বাসভবন তবু এর বহু অংশই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। স্টেট রুমসগুলোতে বহু মূল্যবান পেইন্টিংয়ের সংগ্রহ রয়েছে তার মধ্যে রেমব্রাঁ, রুবেনস, পসিন এবং আরো প্রায় ডজনখানেক বিশ্বখ্যাত শিল্পীর ছবি, প্রস্তরমূর্তি এবং গৃহসজ্জার বিভিন্ন আসবাবপত্র এক মনোরম অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাকিংহাম প্রাসাদে বিভিন্ন সময় সংস্কারকাজ চালানো হয়েছে। ১৯১৩ সালে স্যার অ্যাস্টন ওয়েব বাকিংহাম প্রাসাদের বহির্ভাগ এবং রানী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেন নির্মাণ করেন। বিশ্বের সর্ববৃহত্তম রাজপ্রাসাদ হচ্ছে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ। সুইডিসবাসী কিন্তু মনে করে যে তাদের রাজপ্রাসাদ কুংলিগাস্লটেই হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকেও বড়। আমার লিখিত বই 'সুইডেন শান্তির দেশী'-এর ষোড়শ অধ্যায়ে মেলারেনহ্রদ ভ্রমণের সময় আমাদের গাইড গর্বভরে বলেছিল যে, তাদের রাজপ্রাসাদ কুংলিগাস্লটে সর্বমোট ৬০৮টি কক্ষ

www.pathagar.com

রয়েছে যা বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে একটা বেশি। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থায়ীভাবেই এই প্রাসাদটি রাজা-রানীদের বসবাসের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, লর্ড গোরিং ১৬৩৩ সালে এখানে একটা বাড়ি করেন এবং ডিউক অব বাকিংহাম ১৭০৩ সালে বর্তমানে যেখানে বাকিংহাম প্রাসাদটি রয়েছে সেখানেই বাকিংহাম নামে একটা অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বাকিংহামের উত্তরাধিকারী স্যার চার্লস শেফিল্ড রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। অপ্রকৃতিস্থ তৃতীয় জর্জ এই ভবনটিকে রাজপ্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার না করে তার স্ত্রী রানী সারলটকে ব্যক্তিগত অবকাশের জন্য এই ভবনটি বরাদ্দ করে দেন। রাজকীয় ভবন থাকল সেন্ট জেমস প্রাসাদটি যা এখন পর্যন্ত কোর্ট অব সেন্ট জেমস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে যেখানে রানী এলিজাবেথের কাছে অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরা রানীর সাথে আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আসেন।

বাকিংহাম প্রাসাদ ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

রাজা চতুর্থ জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজপ্রাসাদের মর্যাদা দিলেন। চতুর্থ জর্জ ছিলেন অমিতব্যয়ী। তিনি এই প্রাসাদটিকে ইউরোপের অতীব সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে জন ন্যাশ নামে এক স্থপতি নিয়োগ করেন। রোমের আর্ক অব কনস্টেনটাইনের অনুকরণে তিনি একটি সিংহ দরজা নির্মাণ করার জন্যও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার আশা অপূর্ণই থেকে

www.pathagar.com

যায়। মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নেয়। যথাস্থানে সিংহদরজা হয়নি বটে তবে এর স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে যেখানে অ্যাডমিরালটি আর্চ, সেখানে নির্মাণ করা হয় এবং অ্যাডমিরালটি আর্চ নামেই বর্তমানে প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে যে, চতুর্থ উইলিয়াম যখন রাজা হলেন তখন তিনি স্থপতি ন্যাশকে বিদায় দিলেন এবং তার স্থলে এডওয়ার্ড ব্লোর নামে এক স্থপতিকে নিযুক্ত করেন। তিনিই বর্তমানের ক্ল্যারেন্স হাউস নির্মাণ করান এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। ততদিনে বাকিংহাম প্রাসাদ নির্মাণে প্রায় ৭ লাখ ১৯ হাজার

কুইন ভিক্টোরিয়া

পাউন্ড খরচ হয়ে গিয়েছিল। ক্ল্যারেন্স হাউসের ইতিহাসও দীর্ঘ। এই ভবনে রানীমাতা এলিজাবেথ দীর্ঘ ৫০ সালে নিজ বাসগৃহ হিসেবে অবস্থান করেন। (১৯৫৩ সন থেকে ২০০২ সালে মৃত্যু পর্যন্ত)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এক অগ্নিকাণ্ডে পার্লামেন্ট ভবন ভস্মীভূত হয়, তখন রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সাধের রাজপ্রাসাদটি পার্লামেন্ট ভবন হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন কিন্তু সংসদ সদস্যরা ধন্যবাদ জানিয়ে তা নিতে অস্বীকার করেন এবং পুরনো পার্লামেন্ট ভবনকেই পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ইতিহাসকে যদি আমরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই একদিকে রাজা চতুর্থ উইলিয়াম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুদৃশ্য ভবনকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান ২৫০ বছর পর ২০০১ সালে সরকারি প্রাসাদ গণভবনকে ছলেবলে কৌশলে

www.pathagar.com

আইন করে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে চাচ্ছেন। আমাদের দেশপ্রেমের নজির এখান থেকেও পাওয়া যায়।

ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ রানী ভিক্টোরিয়াই প্রথম সম্রাজ্ঞী হন ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৮ বছর বয়সে। বাকিংহাম প্রাসাদকে তিনি প্রথম থেকেই পছন্দ করেন এবং বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স আলবার্টের সাথে তার বিয়ে হয় এবং তারা দুজনে প্রাসাদ সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে প্রাসাদের পূর্বদিকে যে অংশটি মল থেকে দেখা যায় এই অংশটি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন।

মার্বল আর্চ হচ্ছে হাইড পার্কের দিক থেকে প্রাসাদ এলাকায় ঢোকার পথ। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে আলবার্টের মৃত্যুর পর রানী ভিক্টোরিয়া নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নেন এবং বাকিংহাম প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে কখনো লন্ডন থেকে ৫০-৬০ মাইল দূরে অবস্থিত উইন্ডসর ক্যাসেলে, কখনো স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেলে এবং গ্রাম্য নিরিবিলি পরিবেশে প্রিন্স অ্যালবার্ট কর্তৃক নির্মিত অসবোর্ন হাউসে থাকা শুরু করেন। এতে তিনি গণসমালোচনার সম্মুখীন হন। সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি অনুষ্ঠানাদির সময় বাকিংহাম প্রাসাদ ব্যবহার করতে থাকেন।

বাকিংহাম প্রাসাদের সামনে যে কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্তিটি এবং তৎসহ সুন্দর বাগানটি রয়েছে তা নির্মাণ করেন পঞ্চম জর্জ। পঞ্চম জর্জ ও কুইন মেরি রাজপ্রাসাদটিকে রুচিসম্মতভাবে সাজান এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি এই প্রাসাদে সর্বমোট ১৯টি স্টেট রুম, ৫২টি অতি উচ্চমানের বেড রুম, ১৮৮টি স্টাফ বেড রুম ও ৯২টি অফিসারদের উপযুক্ত বেডরুম এবং বাথরুম, ডাইনিং রুমসহ যাবতীয় কক্ষ নির্মাণ করান এবং উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই প্রাসাদটিকে ধ্বংস করার জন্য জার্মানরা টার্গেট করে বহুবার বোমাবর্ষণ করেছে কিন্তু রাজ্যের জনগণের মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য রাজা এবং রানী এই প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোনো অধিকতর নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাননি। একবার বোমায় রাজা-রানীর বাসভবনটির সব জানালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর একবার বোমায় প্রাসাদের গির্জাটি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। রাজা-রানী তবু প্রাসাদ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাননি। জনগণের সাথে এই যুদ্ধের ভয়-ভীতি ও ঝক্কি-ঝামেলা সমানভাবে বহন করেন। এতে যুদ্ধরত ইংরেজ জনগণের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এবং জয় অর্জন করার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। রাজ দায়িত্ব পালন করার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

www.pathagar.com

বর্তমানকালেই ফিরে আসি। বর্তমান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথও এই প্রাসাদকে নিজ বাসস্থান হিসেবেই ব্যবহার করে আসছেন এবং প্রাসাদ সংলগ্ন ৪০ একর বিস্তৃত বাগানটিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে দেখাশোনা করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ধরনের গাছ এখানে এনে রোপণ করেন। তিনি তার নিজের তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট বাগান নিয়ে বেশ গর্ববোধ করেন। কথিত আছে যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যখন স্টেট ভিজিটে ইংল্যান্ড আসেন তখন প্রাসাদ চত্বরে অবতরণের জন্য হেলিপ্যাড তৈরি করতে হয়েছিল। সে উপলক্ষে অনেক মূল্যবান বৃক্ষ কাটতে হয়েছিল। রানী তার বাগানের পরবর্তী রূপ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন প্রেসিডেন্টের জন্যে তার সযত্নে রোপিত অনেকগুলো বৃক্ষের আত্মাহুতি দিতে হলো। এই বাগানটি রাজপরিবারের একান্ত উদ্যান। তবে বছরে একবার রানী এবং তার স্বামী এখানে লন্ডনের প্রায় ৩০,০০০ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে প্রতি বছর জুলাই মাসে আপ্যায়ন করেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ডিপ্লোমেটিক কোরের অফিসারও শামিল থাকেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালে লন্ডনে থাকাকালীন আমার ও আমার বেগম সাহেবাকেও রানী তার গার্ডেন পার্টিতে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন ১৭ জুলাই ১৯৫৮ সালে। বাগান ছাড়াও রানী একবার আমাকে এবং বেগম সাহেবাকে প্রাসাদের এক সান্ধ্য পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে সময় প্রাসাদের আইন-কানুন মোতাবেক টেইল কোট ও আনুষঙ্গিক, ড্রেস শার্ট, বোটাই ও যাবতীয় সরঞ্জামাদি পরিধান করে যেতে হয়। সে সময়েও পূর্ণ পোশাকের দাম হতো প্রায় ২০০ পাউন্ডের মতো। এত টাকা খরচ করে রানীর দাওয়াত রক্ষা করতে হতো। তবে এগুলো ভাড়ায়ও পাওয়া যেত। আমার স্টেনোগ্রাফার মিস মেলেটের সাহায্য ভোলার নয়। তিনি সময়মতো পোশাক সরবরাহকারী কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে ট্রায়াল ডেট ঠিক করে ফেলল যাতে সময়মতো আমি সেগুলো পেয়ে যাই।

৯ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে আমরা সর্বতোভাবে তৈরি হয়েই বাকিংহাম প্যালেসে গেলাম। এই সংবর্ধনা সমাবেশে রানীর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা, রানীর পরিবারের সদস্যরা, বিদেশী কূটনীতিবিদরা উপস্থিত থাকেন। রানীমা এবং প্রিন্সেস মার্গারেট, রানীর স্বামী, প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, বিরোধী দলের নেতা হিউ গেটস্কেল এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে আলাপ হলো। রানী দ্বিতীয় এলিজারেথের সাথে হালকা করমর্দন করা হলো। তিনি আমার গৃহিণীর সাথে কিছু আলাপও করলেন। সন্ধ্যাটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল।

বাকিংহাম প্যালেস এবং বাগান জনসাধারণের জন্য চতুর্থ আগস্ট থেকে ৩০

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশমূল্য দিতে হয় ১০ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ১২০০ টাকা। এর সব আয়ই রানীর গ্যালারিতে খরচ করা হয়। এভাবেই ইংরেজরা সর্বদা সরকারি তহবিলের ওপর নির্ভর করে থাকে না। কোন কিছুর উন্নয়নের জন্য যতটুকু পারে এবং যেখান থেকে পারে আয় করে নিতে চেষ্টা করে। এই কৃষ্টি যদি আমাদের দেশেও গড়ে ওঠে তাহলে সরকারি বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে।

অনেক বেলা হলো এবং একদিনের জন্য হাঁটাচলাও হলো যথেষ্ট। তাই এবার গ্রিন পার্কের মধ্য দিয়ে সোজা যে রাস্তাটি কনস্টিটিউশন আর্কের দিকে গেল, সে রাস্তা ধরেই এগোলাম। গ্রিন পার্কের উত্তর প্রান্তে যে মনুমেন্টটি রয়েছে তা পাশে রেখে আমরা অহরহই আনাগোনা করছি কিন্তু এটা কি এবং এই আর্কের মধ্য দিয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে কেন আমরা যাচ্ছি তা কখনো আমাদের মনে উদয় হয়নি। আজ একটু পরেই আমি প্রবেশ করবো পাতালপথে ঘরে ফেরার জন্য তাই কনস্টিটিউশন আর্ক যা গ্রিন পার্ক আর্ক নামেও পরিচিত তা সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করলাম। ১৮২৮ সালে নির্মিত এই আর্কের নির্মাতাও জন অ্যাশ। এর একটু ইতিহাস রয়েছে যা তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

ডিউক অব ওয়েলিংটনের স্মৃতিসৌধ হিসেবে এই সংস্থিতিটিকে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই স্মৃতিসৌধটি আগে বাকিংহাম গেটের মূল প্রবেশদ্বার ছিল। এই সংস্থিতিটিকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বাকিংহাম প্রাসাদ গেট থেকে সরিয়ে হাইড পার্ক কর্নারে নেয়া হয়। ১৯৬০ সালে এই প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বর্তমানে গ্রিন পার্কে ঢুকতে হলে এই গেটকে পাশ কাটিয়ে ঢুকতে হয়।

অলস ক্লান্ত পদক্ষেপে আমি গ্রিন পার্ক টিউব স্টেশন থেকেই ঘরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

www.pathagar.com

নয়.

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রেল

আজ ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার। দিনটা ছিল আর্দ্র এবং মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছিল। তাপমাত্রা প্রায় আগের দিনের মতোই ২৭-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘরে বসে থাকব না রাস্তায় বেরুব এই দ্বিধাদ্বন্দ্বেই কাটল প্রায় বেশ কিছুটা সময়। তারপর দুপুর ১২টায় বেরিয়েই পড়লাম।

সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল

www.pathagar.com

আজ আমার যাত্রা শুরু হবে সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল থেকে। বেলা ১টায় ক্যাথিড্রালে পৌঁছলাম। এই ক্যাথিড্রালের ইতিহাস উদঘাটন করতে গিয়ে জানলাম যে, ৬০৩ খ্রিস্টাব্দে স্যাক্সনরা লন্ডনে প্রথম এই চার্চটি তৈরি করে। উইলিয়াম দ্য কঙ্কারারের সময় এই চার্চ ভস্মীভূত হয়। পুরনো ভিত্তির ওপরই নতুন করে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। এর নির্মাণকাজ শেষ হয় ১১০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় ৫০০ বছর পর ১৬৬৬ সালে সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল পুনরায় আগুনে পুড়ে যায়। এবার নতুন করে স্যার ক্রিস্টোফার রেন এর নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শেষ করেন। বর্তমান ক্যাথিড্রাল প্রায় ৬০০ ফিট লম্বা এবং ৫২০ ফিট উঁচু। লন্ডনের এই আলীশান ক্যাথিড্রালের গম্বুজ রোমের সেন্ট পিটার ডোমের পর বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম গম্বুজ। এই গম্বুজটি টেমস নদীর ওপর থেকে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়।

নিচের তলায় গ্যালারি আছে, তা দেখতে লাগবে ৮ পাউন্ড। ভাগ্যিস বয়স ৬৫ এর ওপর তাই কনসেশনে ৫ পাউন্ড দিতে হলো। বছরে লক্ষাধিক লোক এখানে প্রার্থনা করতে আসেন কিংবা পর্যটক হিসেবে দেখতে আসেন। পর্যটকের সংখ্যা পূজারী থেকে অনেক বেশি। ৮ পাউন্ডের টিকিট কেটে প্রার্থনা করতে কেউ আসবে, বলে মনে হয় না। তবে বিনা টিকিটে এসে চ্যারিটি বক্সে দু-চার পাউন্ড দিতে অনেকেরই আপত্তি থাকে না। এখানে জ্ঞান অন্বেষণের মনোবৃত্তি নিয়েই পর্যটকরা আসেন। ইতিহাস জানতে আসেন, ধর্ম জানতে নয়। বিশ্বব্যাপী মসজিদগুলোকেও তাই দেখেছি। নামাজ পড়তে যান এবং দান বাক্সে উদ্বৃত্ত ২-৪ টাকা ফেলে আসেন।

এই ক্যাথিড্রালের ভেতরেই রোমান আমলে রক্ষিত অতি মূল্যবান রুপোর বাসন-কোসন, চার্চের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যা সযত্নে রক্ষিত আছে। এগুলো এত ঝকঝকে যেন মনে হয় এই মাত্র ধুয়েমুছে সাজিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে যেসব বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, তাও এখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ইস্পাতের আলমারিতে অতি স্বচ্ছ পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা থাকে, এ সবই সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা সেকশনে গেলাম এবং সেখানে দেখতে পেলাম দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতিফলক কিংবা দেহাবশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করা হচ্ছে। সাউথ আফ্রিকায় বুয়ের যুদ্ধে যারা মারা গেছেন তাদের স্মৃতিফলক, অন্যান্য কলোনিতে যেখানেই

www.pathagar.com

যুদ্ধে ব্রিটিশরা তাদের প্রাণ হারিয়েছে তাদের স্মরণে এবং দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে ফলক সাজিয়ে রেখেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের স্মরণেও স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের পাথরের মূর্তির পাদদেশে লেখা আছে "Born 12 May 1820 and died 19 August 1910"

নেলসনের সমাধি এখানে রয়েছে প্রায় ৭ ফিট উঁচু বেদির ওপর পাথরের কফিনে। War hero যারা দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন ছবিসহ তাদের নাম দেয়ালে লেখা রয়েছে। Arthur Duke of Wellington যিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেছিলেন তার দেহাবশেষও নেলসনের দেহাবশেষের মতোই ৭ ফিট উঁচু বেদিতে পাথরের কফিনে রাখা হয়েছে। দেখলাম- Field Marshall Auchinlake, Commander in chief of India, Alexander Flemming যিনি পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন তার জন্য একটা ফলক রাখা হয়েছে, যাতে লেখা আছে born 6th August 1881 died 11th March 1953। বেশ সময় নিয়েই এই সেকশনটি দেখলাম।

সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল থেকে অল্প দূরেই টেমস নদী এবং সেখানে পায়ে হাঁটা একটা লোহার সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল ২০০০ সালকে উপলক্ষ করে এবং তার নাম দেয়া হয়েছে মিলেনিয়াম সেতু। এই সেতু পার হলেই টেমস নদীর দক্ষিণে টেইট মডার্ন প্রদর্শনীতে যাওয়া যায় এবং কাছেই থাকে প্রসিদ্ধ গ্লোব থিয়েটার। সেন্ট পল এলাকাটা হচ্ছে ঘিঞ্জি এলাকা কিন্তু নদীর অপর পারটা বেশ সুপরিসর তাই মিলেনিয়াম সেতু পার হয়ে অনেকেই বিকেল কিংবা সন্ধ্যাটা অপর পারেই কাটায়।

প্রদর্শনী এলাকা পার হয়ে আমি আরাধনা এলাকায় এলাম। এখানে পূজার্চনা হচ্ছিল। কাঠের বেঞ্চি সারি সারি পাতা রয়েছে। তাতে বসে পূজকরা নিবিষ্ট মনে 'হিম' ও 'কয়ের' প্রভু যিশুর উদ্দেশে নিবেদিত গান শুনছে। এদের গড এবং যিশুর উদ্দেশে নিবেদিত গানের সময় পেছন থেকে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সঙ্গত দেয়া হয়ে থাকে এবং স্টেজে দায়মান চার্চের খুদে খুদে শিক্ষার্থী গলা ছেড়ে যখন গান গায় তখন বেঞ্চে উপবিষ্ট পূজারী ও পূজারিণী সবাই গলা মিলিয়ে আরাধনামূলক গান গাইতে পারে। আমিও পূজারীদের সাথে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার ছলে ধ্যান করলাম। হিম ও কয়ের শুনতে বেশ ভালোই লাগে এবং গাওয়াও সহজ। বাদ্যযন্ত্রের সাথে ভাবার্থ মিশিয়ে প্রায় একই সুর ও লয়ে গান গাওয়া হয়।

www.pathagar.com

ইংল্যান্ডের স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল ত্যাগের আগেই বহুসংখ্যক হিম অর্থাৎ ধর্মীয় সঙ্গীত শিখে ফেলে। আমাদের দেশেও এরূপ প্রথা চালু করলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও বহু হামদ ও নাত শিখে ফেলতো। হামদ ও নাতের পেছনে সঙ্গত দেয়ার জন্য অথবা সুর ধরিয়ে দেয়ার জন্য একটু তাল মিশ্রিত সুরের সংযোজন করলে আমাদের ধর্মচ্যুতি ঘটত বলে আমার মনে হয় না অথচ বা শিশুরা হামদ ও নাত গাইতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধর্মীয় সঙ্গীত শুনলাম।

তারপর আমি উপাসনালয় অর্থাৎ "Church Floor" থেকে বেরিয়ে এসে উপরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আমাকে দেখে যাত্রাপথের প্রহরী প্রশ্ন করল 'আপনি কি যেতে পারবেন?' বয়স্ক লোকদের ওপরে যাওয়া মানা। আমার আত্মবিশ্বাস প্রচুর এবং ১৯৮৯ সালে Royal Free Hospital এর স্পেশালিস্ট M. O. D. Bruce আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, আমার হার্ট ঘোড়ার হার্টের মতো শক্তিশালী, সেই ভরসায় আমি আমার ভ্রমণসংক্রান্ত ব্যাপারে হার্ট নিয়ে আর ভাবিনি। তাই আজও বৃদ্ধ প্রহরীর সতর্ক বাণী উপেক্ষা করেই আমি ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকলাম।

প্রথম গ্যালারিতে বিশেষ কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় গ্যালারিটাই হচ্ছে তৃতীয় স্তরে যদি ভূনিম্নস্তরকে প্রথম স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় গ্যালারিকে Whispering Gallery বলা হয়। এ পর্যন্ত বেশ প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি এবং ধাপের উচ্চতাও ছিল স্বাভাবিক ৫-৬ ইঞ্চি করে। গ্যালারির মেঝে উঁচু নিচু বলে প্রায় স্থানেই মাথা সামলানোর সতর্ক বাণী লেখা থাকে "**Mind** your head" উচ্চতায় খাটো বলে আমার চলাফেরা খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

এর ওপরের স্তর হচ্ছে 'Stone Gallery' এবং পরের গ্যালারিকে বলা হয় "Golden Gallery" আমরা বিশেষ করে আমি ও আমার মতো যারা বিজয়কে হাতের মুঠোয় পেতে চায় তারা একটা একটা করে সিঁড়ি পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে, নতুনত্বের পানে। আমরা এখন গোল গম্বুজের পাদদেশে পৌঁছলাম। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গম্বুজ হচ্ছে এই সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের গম্বুজ। আমরা ছোট দরজা দিয়ে বাইরে রেলিং ঘেরা গোল বারান্দায় উপনীত হলাম। আমরা হয়তো এতক্ষণে ২০০ ফিট ওপরে উঠেছি। কিন্তু বাইরের রাখা ঢাকা সৌন্দর্যে যেন মোহিত হয়ে পড়লাম। একটা পাশ থেকে টেমস নদী এবং তার ওপর সেতুগুলো এবং আশপাশের জীবন্ত এলাকা মুগ্ধ নয়নে আমরা দেখলাম।

www.pathagar.com

টেলিভিশন টাওয়ার দেখলাম এবং দেখলাম লিভার ব্রাদার্সের অর্ধ বৃত্তাকার ভবন যা সম্বন্ধে দুই দিন আগে নৌবিহারের সময় আমাদের গাইড খুবই গুরুত্ব দিয়েছিল তাও নজরের সামনে উদিত হলো। কিন্তু কিম্ভূতকিমার একটা বৃহৎ মিসাইল সদৃশ ভবন দেখলাম। অনেকেই আর ওপরে যেতে চাইল না। আমি বাইরের দৃশ্য দেখে এসে আবার ডোম (গম্বুজ)-এর ভেতর দিয়ে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি ধরলাম। গম্বুজের ভেতরের গ্যালারিটিই হচ্ছে হুইসপারিং গ্যালারি। ডোমের ওপরে ওঠার ও নামার সিঁড়ি আলাদা। লোহার উঁচু উঁচু ঘুরানো সিঁড়ি বড়জোর ৩ ফিট প্রশস্ত। লোহার রেলিং ধরে একজনের পেছনে একজনকে ধীর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে হয়। দৃশ্যটা অনেকটা ধীর লয়ে সরু পথে পূজারীদের পর্বত আরোহণের মতো। একবার অভিযাত্রা শুরু করলে শুধু সামনেটাই খোলা। আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার আর কোনো রাস্তা নেই। তাই চলতেই হয়। তবে ২৫-৩০ স্টেপ যাওয়ার পরপর আমাদের মতো দুর্বল অভিযাত্রীদের জন্য একটু বসার জায়গা করে রেখেছে।

এরূপ একটা জায়গায় থেমেছি তখন শুনছি এক আমেরিকান গ্রুপ বলছে, আমাদের জন্য আর কোনো দেশে যাওয়াই নিরাপদ নয়। বুশ সমগ্র বিশ্বে অকারণেই আগুন ছড়িয়েছে। এককালের মিত্র দেশ এখন মৃত্যুর দেশে রূপ নিয়েছে। আমি একাধারে বসে এসব শুনছি খাস আমেরিকানদের ক্ষেদ ও ক্ষোভ, তাদের হা-হুতাশ।

আমরা ধীরে ধীরে গোল্ডেন গ্যালারিতে পৌঁছলাম এটাই সর্বোচ্চ পয়েন্ট। এখানেও গম্বুজের বাইরে রেলিং ঘেরা বারান্দা রয়েছে। হিমশীতল ঝড়ো বাতাস বইছিল এবং সাথে বৃষ্টি, তাই সম্পূর্ণ স্থানটিকেই অসহ্য করে তুলেছিল। এই গ্যালারি থেকে সমগ্র লন্ডন দেখা যায়, তাই বিরূপ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও এখানে বেশ ভিড় জমে থাকে এবং ভিড় ঠেলে ঠেলেই ৫৫০ ফিট ওপর থেকে লন্ডন দেখতে হয়। অগত্যা আমাকেও তা-ই করতে হলো।

এই ট্রিপটি বেশ কষ্টকর ছিল। তাই রেলিং ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠার স্মৃতি বহু বছর পর এখনো অম্লান রয়েছে। ধীরে ধীরে আবার নিচে নামলাম এবং ক্যাথিড্রালের বাইরে প্রশস্ত সিঁড়িতে বসে আমার বয়ে আনা চিঁড়ে-গুড়সহ পানি সেবন করলাম অর্থাৎ এ দেশীয় প্রথামতো স্যান্ডউইচ ও কোমল পানীয় দিয়ে শরীরটাকে তৃপ্ত করলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে ওল্ড বেইলিতে অর্থাৎ কোর্ট এলাকায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ক্রিমিন্যাল

www.pathagar.com

কোর্ট নজরে এল। প্রাক্তন নিউগেট জেলের স্থানে ১৯০৭ সালে এই কোর্টটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ এলাকার কোর্ট অবশ্য ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকেই বিরাজ করছিল। এমন কিছু এখানে নেই যা দেখার মতো, তবে আইনজ্ঞরা এখানে প্রাচীন বিচারব্যবস্থার অনেক কিছুই দেখতে পাবেন এবং বিচারব্যবস্থা কিভাবে ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে তা সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। ১৮টি কোর্ট রুম এখানে রয়েছে এবং মূল গেটেই দিনের প্রারম্ভে কোন কোর্টে কী বিচার এবং কার বিচার হচ্ছে তার ফর্দ টাঙিয়ে দেয়া হয় এবং যার যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়েই বিচার দেখতে পারে।

Central Criminal Court ডান দিকে রেখে অগ্রসর হলাম। এটা একটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভবন। ওপরে চার্চের গম্বুজটাও বেশ বড়। বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এই গম্বুজের ওপর একটা মূর্তি রয়েছে এবং সেই মূর্তির হাতে দাঁড়িপাল্লা, ন্যায়বিচারের মাপকাঠি। ক্রিমিনাল কোর্ট এলাকা পরিহার করাই ভালো তাই এগিয়ে চললাম।

একটু পরই রাস্তার পাশে দেখলাম ছোট একটা দালান এবং সদর দরজার সামনে লেখা রয়েছে "সিটিজেন অ্যাডভাইজ ব্যুরো। দরজায় আরো লেখা আছে শান্তির জন্য ভেতরে আসুন"। শান্তির আকর্ষণ এমনই যে, পাপীষ্ঠও তা পায়ে ঠেলতে পারে না। বিশ্বের আদি থেকে মানুষ শান্তি চেয়ে আসছে কিন্তু শান্তি মরীচিকার মতো সর্বদাই দূরে থেকেছে। আজ হাতের কাছে শান্তি হাতছানি দিচ্ছে তাই নির্দ্বিধায় তখনই ভেতরে ঢুকলাম। ছোট একটা গির্জা সব মিলে ৭০-৮০ ফিট লম্বা এবং প্রস্থে ৪০ ফিটের মতো। কোনো লোক নেই কোনো জন নেই। কোনো সাড়া নেই কোনো শব্দ নেই। সব মিলে দেখলাম শ-খানেক চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং দেখলাম মাত্র দু জন দুটি ভিন্ন স্থানে ধ্যানে মগ্ন।

আমারও বসতে মন চাইল। শান্ত পরিবেশটাই যেন মনকে টেনে নিল। বহু দিন আগে ১৯৯৭-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টনের কাছে গ্যালভেস্টন দ্বীপে গিয়েছিলাম। সেখানে কাচ নির্মিত বিশাল পিরামিড আকৃতির একটা ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। এই ঘরটির ভেতরে একটা বাগান তৈরি করে রাখা হয়েছে যেখানে গাছ, পাখি, আলো ও আঁধারের এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এর ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকলে মনে হবে ধীরে ধীরে সমস্ত শরীর শীতল হয়ে আসছে, মন প্রশান্ত হয়ে আসছে। এই ঘরের উদ্ভাবক ছিলেন ক্যাপটেন মুডি। তিনি মনে করতেন– মানুষ বর্তমান যুগের গতির

www.pathagar.com

সাথে তাল রাখতে যেয়ে অবসন্ন ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য চাই শান্তি-অনাবিল শান্তি নির্ভেজাল শান্তি-নিরঙ্কুশ শান্তি। এ ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ মনকে অশান্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে ঝিমিয়ে পড়া কিংবা অবসাদগ্রস্ত মনকে সজীব করে তোলে। অত্যধিক আবেগতাড়িত মনকে শান্ত করে এবং মানসিক চাপ অবদমনে সাহায্য করে। ঘরে থেকেও মনকে সাংসারিক চিন্তা থেকে দূরে রাখার জন্য ধ্যান করা যায় বটে কিন্তু নিবিষ্টতা আসে না বলে প্রশান্তি লাভ করা বাধাগ্রস্থ হয়।

তাই 'শান্তির জন্যে ভেতরে আসুন' আহ্বান আমাকে টেনে নিয়ে গেল চার্চের ভেতরে। কতক্ষণ বসে ছিলাম এবং শান্তির চিন্তায় মগ্ন ছিলাম তা বলতে পারব না। তবে চরম শান্তি যে পেয়েছিলাম এটা বেশ মনে পড়ে। বোধহয় মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনকে চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারলে শান্তি অবশ্যই পাওয়া যায়।

চার্চ থেকে বেরিয়ে আমি নিউগ্রেট স্ট্রিট ধরে পূর্ব দিকে চললাম এবং পৌঁছে গেলাম একটা ছোট পার্কের কোনায়। এক পাশে থাকল মিল্ক স্ট্রিট, অন্য পাশে থাকল ব্রেড স্ট্রিট। বহু দিন আগে এই অঞ্চলই ছিল পুরনো শহর তাই মিল্ক স্ট্রিট, ব্রেড স্ট্রিট থাকাটাই মনে হলো যুক্তিসঙ্গত।

এই পুরনো শহরকে ঘিরেই বর্তমান বৃহত্তর লন্ডন গড়ে উঠেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। চিপসাইড রোডের ধারেই, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কাছে সিটি অব লন্ডন। এখানেই গিল্ড হল অবস্থিত। কয়েকশ বছর ধরে এই গিল্ড হলই লন্ডনের টাউন হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই স্থানটিতে রোমান যুগে 'অ্যামপিথিয়েটর' (রোমানদের উদ্ভাবিত উঁচু দেয়াল পরিবিষ্ট গোলাকার ছাদহীন রঙ্গ মঞ্চ) ছিল। এরপর এখানে বড় বড় পাথরের ব্লক দিয়ে গিল্ড হল তৈরি হয়। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের লন্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গিল্ড হলের অনেক ক্ষতি হয় এবং ব্যাপক মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্তমানে সিটি করপোরেশনের অফিস এই গিল্ড হলের কাছেই।

লোককাহিনী আছে যে 'গগ' এবং 'মেগগ' নামে দুই দৈত্যকে গিল্ড হলের সদর দরজার দুই প্রান্তে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। দৈত্যরা এখন নেই কিন্তু তাদের মূর্তি এখনো গিল্ড হলে রক্ষিত আছে। শুধু বছরে একবার লর্ড মেয়রের প্রদর্শনীর দিনে এই মূর্তি দুটোকে বের করা হয়।

www.pathagar.com

রয়াল কোর্ট অব জাস্টিস এখানেই অবস্থিত। এটাই হচ্ছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের হাইকোর্ট। এখানেই অবস্থিত সিটিজেন অ্যাডভাইজরি ব্যুরো। যেসব বিচারপ্রার্থীর আইনের আশ্রয় নেয়ার মতো অর্থবল নেই, তারা এই ব্যুরোতে গিয়ে আবেদন করলে সরকার থেকে আইনি সাহায্য দেয়া হয়।

পুরনো লন্ডনের অনেক রাস্তাই এখনো পাথরের ব্লক দিয়েই তৈরি। এরা ঐতিহ্য রক্ষা করতে চায় বলেই এসব রাস্তা এখনো রেখেছে। রাস্তাও খুব একটা প্রশস্ত নয়। আমি এখানে অলিগলি ঘুরলাম প্রায় ঘণ্টা দুই এবং বাইরে থেকেই দেখলাম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন স্টক এক্সচেঞ্জ। প্রায় ৩০০ পূর্বে এর কার্যক্রম শুরু হয়। দেখলাম ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, সমারসেট হাউস ও কিংস কলেজ। পড়ন্ত বিকেলে আমি আজকের কার্যক্রমের ইতি টেনে ঘরে ফিরলাম।

www.pathagar.com

দশ.

উডফোর্ড অঞ্চল

আজ জেনিদের বাসায় এসেছি। জেনিকে আবিষ্কার করেন আমার মরহুমা স্ত্রী নাজমা রহমান। প্রাত্যহিক ভ্রমণের শখ ছিল আমার গৃহিণীর। সেরূপই নিয়মিত এক ভ্রমণে সাক্ষাৎ হলো রাস্তায় নয়– বাড়ির দেয়ালের এপার-ওপারে। আমার গৃহিণীর ভাষায় আজকে না উডফোর্ড স্টেশন থেকে যে রাস্তাটি ওপরের দিকে চলে গেছে সে রাস্তায় কতটুকু যাওয়ার পর কোণের বাড়িটাতে দেখলাম অতি সুন্দরী এক বাঙালি বউ বাগান করছে। খুব ভালো লাগল তাই দাঁড়ালাম। ফুলের গাছ লাগানোর জন্য 'বেড' তৈরি করছে। 'আমার বেগম সাহেবারও গাছের প্রতি দরদ আছে, তাই তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন। একটু পর মেয়েটিই এল, আলাপ-পরিচয় হলো এবং সখের সৃষ্টি হলো। মেয়েটি আমার কন্যা বীথির বান্ধবী। এক মুহূর্তেই রাস্তার অপরিচিত মহিলা থেকে খালাম্মাতে পরিবর্তিত হলো সম্বন্ধ– আর সেই সম্বন্ধ আজও অটুট আছে। খালাম্মা নেই এই দুনিয়ায় কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে আমি জেনির খালু বনে গেছি।

আজ ২০০৩ সালের ১৮ জুলাই জেনির স্বামী আনসার আলী সাহেব ১০টায় আমাকে বীথির বাসা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এল তাদের বাসায়। কিছুটা সময় কাটাব তাদের সাথে এবং পরে জুমার নামাজ পড়তে যাব। জেনির বাসাটা আমার খুবই ভালো লাগে এ জন্য যে, জেনি নিজ হাতে বাগান থেকে শুরু করে ঘরের প্রতিটি জিনিস অতি নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখে। কোথায় নীল রঙের ফুলের পটটি রাখবে, কোন দিকটায় বাগানের চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখবে, লনের ও পাশের গাছগুলোতে কখন খাদ্য কিংবা ওষুধ স্প্রে করতে হবে, কখন সুইমিংপুলের পানি বদলাতে হবে, লনের মাঝখানে যে ছোট পুকুরটি আছে তার কোথায় পাথরে

www.pathagar.com

নির্মিত সারস পাখিটি স্থাপন করতে হবে, কোন দিকটায় পদ্ম ফুলগুলো লাগালে জলজ বাগানটি আরো সুশ্রী হবে, নৌম-Gnome (রূপকথার পাতালবাসী ভূত)-এর প্রস্তর মূর্তিটি কোথায় রাখা হবে ইত্যাদি কাজে নিজেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। এভাবে আদর-যত্ন দিয়ে বাড়িটাকে 'হোমলি' অর্থাৎ অতি মাত্রায় ঘরোয়া, যেখানে প্রতিটি দ্রব্যের ওপরই গৃহকর্ত্রীর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি আছে, প্রতিনিয়ত আদর দিয়ে প্রতিটি জিনিসকে স্পর্শ করছে, প্রতিটি দ্রব্যই ভালোবাসার পরশ পেয়ে অতি আপন হয়ে যাচ্ছে– সে রকম একটি ঘর হচ্ছে জেনিদের ঘর। মনে হয় একটা শান্তির সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এত কিছুর পরও আমার কেন যেন মনে হয় ভালোবাসার সূক্ষ্ম কেতন পতপত করে উড়ছে না। কোথাও যেন একটু বাধা আছে। সে বিষয়ে পরে কোনোদিন বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

প্রতি বছরই লন্ডনে যাই এবং আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা বীথির সম্মানিত মেহমান হিসেবে প্রায় মাসখানেক কাটিয়ে আসি। বীথি বহু বছর ধরে উডফোর্ড এলাকাতেই থাকছে। তাই আমার স্মৃতি উডফোর্ড ঘিরেই গড়ে উঠেছে। পাতাল রেল ব্যবহার করি বলে আমাকে সেন্ট্রাল লাইনের সাথে যোগাযোগ বেশি রাখতে হয়। ঘর থেকে বেরোতেও এই লাইন এবং ফিরতেও এই লাইন। বাসে করে লন্ডন দেখার চেয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে দেখা অনেক সুবিধাজনক। তাই প্রায় সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডেই যাতায়াত করে। ১৯৯০ দশকে বীথিরা চেরি ট্রি রাইজ নামে রাস্তায় একটা দ্বিতল বাসগৃহে অবস্থান করত। এই গৃহে আমি ও আমার বেগম সাহেব প্রায় প্রতি বছরই গিয়েছি এবং আমার বেগম সাহেব, তার কন্যা বীথির পিএইচডি থিসিস লেখার সময় এবং সন্তান হওয়ার সময় ঘরবাড়ি সামলানোর উদ্দেশ্যে একনাগাড়ে বছর-দেড় বছরও থেকেছেন। এই বাসাটি রোডিং ভ্যালি টিউব স্টেশন সংলগ্ন ছিল বলে যাতায়াতে একদিকে বেশ সুবিধা ছিল। আবার অন্যদিকে প্রতি আধা ঘণ্টা পরপর গাড়ি ছাড়ত বলে আমাদের অনেক সময়ই প্রায় ১ মাইল পথ হেঁটে জংশন স্টেশন উডফোর্ড থেকেই যাওয়া-আসা করতে হতো। উঁচু-নিচু হিল্লোলিত পাহাড় বেয়ে আমরা মিয়া-বিবিতে মালামাল টেনে রাস্তার ধারের সুন্দর সুন্দর বাড়িঘরের সামনের বাগান দেখতে দেখতে চলে যেতাম। খুব একটা কষ্ট মনে হতো না বস্তুত আনন্দই পেতাম। সুবিধা ছিল যে রাস্তা সুন্দর ও প্রশস্ত এবং রাস্তার পৃষ্ঠ মসৃণ। তাই চাকা লাগানো বাজারের থলে কিংবা স্যুটকেস টেনে টেনে দিব্যি চলে যাওয়া যায়। এ সব রাস্তায় দু-চার জন বুড়ো-বুড়ি দেখা যায়। আমাদের মতোই ধীরে ধীরে রাস্তা বেয়ে চলছে।

নভেম্বর ১৯৯৯ সালে বীথি উডফোর্ড স্টেশনের কাছে একটা বড় বাড়ি কেনে প্রায়

www.pathagar.com

৮,০০,০০০ পাউন্ড দিয়ে । সেখান থেকে উডফোর্ড স্টেশনটি মাত্র আধা মাইল দূরে হবে। সে বাড়িটি ছিল ৫৪ নম্বর হার্টস গ্রোভে। এখানে টিউব স্টেশন থেকে যাতায়াতে একটু কষ্ট হতো দুটো কারণে। প্রথমত, বাড়িটি ছিল পাহাড়ের ওপর তাই সহজেই অবতরণ করে স্টেশনে পৌছান গেলেও পরিশ্রান্ত হয়ে শহর থেকে ফেরার পথে আরোহণ করাটা খুবই কষ্টকর মনে হতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল যে, গৃহিণী সাথে থাকলে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে পথ চলাটা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ৫৪ নম্বর হার্টস গ্রোভটা বেশ বড় বাড়ি ছিল বলে আমার ও বেগম সাহেবার জন্য একটি ভিন্ন কামরার ব্যবস্থা করা হয় এবং আমরা যত দিন ওখানে থেকেছি বেশ আনন্দেই থেকেছি। ১৯৯৭ সালে বেগম সাহেবার ইন্তেকালের ৬ বছর পর বীথি ২০০৩ সালে তার নতুন কেনা বাড়ি ২৩ স্পেয়রলিজ হিল লাউটন, এসেক্সে চলে যায়। বড় বাড়ির জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে ১.৩ মিলিয়ন পাউন্ড যা তখনকার মুদ্রামানের তুলনায় বাংলাদেশী টাকায় দাম পড়েছিল ১৩ কোটি।

উডফোর্ড অঞ্চলে বহু ঘোরাফেরা করেছি বিশেষ করে হার্টস গ্রোভে আসার পর। সেই সময় রীতিমতো প্রাত্যহিক ভ্রমণে বেরোতাম এবং কোনোদিন বাকহার্স্ট হিলের দিকে, কোনোদিন সাউথ উডফোর্ডের দিকে এবং এভাবেই আশপাশের রাস্তাঘাট, বাগানবাড়ি, উদ্যান, ছোট ছোট বনাঞ্চল, ঝিল এবং এ অঞ্চলের বন্য পশু-পাখি দেখে ঘরে ফিরতাম। দেখতাম ছোট ছোট ঝিলে বন্য হাঁস নির্ভয়ে তীরে বসে আছে কিংবা জলে খেলা করছে। ছোট ছেলেমেয়েরা এদের ওপর কোনো প্রকার উৎপাত কিংবা ভীতি প্রদর্শন করছে না বরং সখ্য বাড়ানোর চেষ্টায় তাদের খাবার দিচ্ছে। ঝিলের বন্য পাখিরাই ছোট ছেলেমেয়েদের আশপাশেই ঘুরছে। বেজি, কাঠবিড়াল ও শেয়ালও দেখা যেত প্রায়ই। বন্য পশুপাখিকে বিরক্ত না করাটাই এদের রীতি ও নীতি হয়ে গেছে। পায়ে হাঁটা পথে দেখতাম অনেকেই পোষা কুকুর নিয়ে বেড়াতে আসত এবং কুকুরগুলোও এতটা পোষা ও প্রশিক্ষিত যে, একে অপরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুরের স্বভাবসুলভ চেঁচামিচি কিংবা ঝগড়া বাধিয়ে বসত না। এর অন্যতম কারণ হলো, পোষা কুকুরগুলোও অভুক্ত থাকত না। ক্ষিদে থাকলেই মন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠে। এই কুকুরগুলো অভুক্ত থাকত না বলেই ঘেউ ঘেউ করে চারদিকের শান্তি বিঘ্নিত করত না। একটা অতি মামুলি চিত্রই পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম ।

উডফোর্ড টিউব স্টেশন ঘিরেই এই অঞ্চলের ছোট ছোট দোকানপাট, ব্যাংক, লাইব্রেরি, কমিউনিটি সেন্টার, ক্লিনিক, মধ্যমানের আবাসিক হোটেল, ট্যুরিস্ট

www.pathagar.com

ইনফরমেশন সেন্টার, ফুলের চারা, ফুলের বীজ, বাগান করার জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম, দু-একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁ এবং দু-একটা বার ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা বিরাজ করছে। সেন্ট্রাল লন্ডনে না গিয়েও জীবনের সব চাহিদা এখানেই মেটানো যায়। ইংল্যান্ডের পুরো লোকালয়েই এই নমুনায় সুযোগ-সুবিধা গড়ে উঠেছে। এখানে যেন অন্য কোনো তৎপরতা নেই। সবই চলছে নিয়মমাফিক ও সুনির্দিষ্ট প্রথামাফিক। লন্ডনের জনসংখ্যা যদিও ঢাকার জনসংখ্যার মতোই এবং আকারেও প্রায় অনুরূপ, তবু সুন্দর ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনার দরুন রাস্তাঘাটে অব্যবস্থা নজরে পড়ে না। ছোট ছোট পার্ক থাকায় লোকদের বিশ্রাম নেয়ার কোনো অসুবিধা হয় না, রাস্তায় জটলা বাধে না। মোটকথা চারদিকেই যেন একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।

আজ ২০০৩ সালের ১৮ জুলাই শুক্রবার, জেনির স্বামী আনসার আলী সাহেব ১০টায় আমাকে বীথির বাসা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এল তাদের বাসায়। উদ্দেশ এখানে একটু চা পান করে আমি ও আনসার আলী সাহেব যাব সাউথ উডফোর্ড স্টেশন সংলগ্ন মসজিদে নামাজ পড়তে। এটাই এ অঞ্চলে সব নজদিগ অর্থাৎ নিকটতম মসজিদ। আমাদের বাসা থেকে মাইল ৪ দূরে হবে। কিছুদিন আগে ১১ সেপ্টেম্বরের জের হিসেবে গোঁড়া খ্রিস্টানরা এই মসজিদটি পুড়িয়ে দেয়। তথাকথিত মৌলবাদীদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই এই হীন কাজটি করে। ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে এবং পুনরায় এই মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। তবে শর্ত জুড়ে দেয় যে, একটা বিশেষ ডেসিবেলের বেশি জোরে আজান দেয়া যাবে না। এই নিয়ম এখন বিশ্বের অনেক দেশেই প্রবর্তন করেছে।

নামাজের পরই এই মসজিদের বাইরে মুক্ত আকাশের নিচে এ অঞ্চলের বাঙালিদের একটা মেলামেশার সুযোগ ঘটে এবং অনেকেই এতে অংশ নেয়। আজ দেখা হলো মিস্টার ফুয়াদ আলী এবং মিসেস শেলী আলীর সাথে। মিসেস শেলী আলীর সাথে আমার পরিচয় বহুদিনের। সেও এক কাহিনী। করাচিতে 'দিলাওয়ার' নামে এক নেভাল এস্টাবলিশমেন্টে একটা ভুতুড়ে বাড়ি বাসস্থান হিসেবে আমার নামে বরাদ্দ করা হলো ১৯৬৬ সালে। বাড়িটি সুন্দর। কোরঙ্গি ক্রিকের ধারে বেশ খোলামেলা স্থানে অবস্থিত। বাড়িটির পেছনে একটা ইতিহাস ছিল বলেই দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে ছিল। আমার বাসার প্রয়োজন তাই আমাকে যখন বাড়িটিতে থাকার অনুমোদন দেয়া হলো, তখন আমি স্বাচ্ছন্দ্যেই তা গ্রহণ করলাম। বাড়িটিতে আছি কিন্তু কেন যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না। বেগম সাহেবাও

www.pathagar.com

মনমরা হয়ে থাকেন। তখন থেকেই একটা না একটা সমস্যার মধ্যে পড়তে থাকলাম। কেন এমন হয়? অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। পরে একদিন লেফটেন্যান্ট চৌধুরী আমার বাসা থেকে দক্ষিণে তৃতীয় বাসাটির বাসিন্দা, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কেন এই বাড়িটি আমি নিলাম। এটা একটা চিহ্নিত বাড়ি। এখানে যারাই থেকেছে তাদেরই কোনো না কোনো ক্ষতি হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী দুজন অফিসার বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তার পরবর্তী একজনের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ফলে মারামারি এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আর একজনের ছেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আমি বললাম যে, সদ্য আমি ইংল্যান্ড থেকে এসেছি তাই এখানকার ইতিহাস আমি কিছুই জানি না। তাই সুন্দর বাড়িটি যখন আমাকে বরাদ্দ করা হলো আমি তা সানন্দেই গ্রহণ করেছি। আর তা ছাড়া আমি এসবে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কদিনের মধ্যেই আমরা কিছু অশরীরী আওয়াজ এবং নিঝুম রাতে কারও পদচারণা শুনতে পেতে থাকলাম। এসব আলামত আমার গৃহিণী ও আমাকে ভাবিত করে তুলল। রাতে সারা বাড়িতে বাতি জ্বালিয়ে অনিদ্রায় রাত কাটাতে থাকলাম। একদিন ভোর রাতের দিকে এক অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম যে আমার ছেলে জিয়া পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচে এক ঝিলে পড়ে যাচ্ছে। আমি নড়তে পারছি না, জিয়াকে সাহায্য করতে যেতে পারছি না, আমার শরীর অবশ হয়ে গেছে। ঠিক এ সময়ে দূরে দেখলাম এক পাগরি পরা কামেল লোক আমাকে বলছেন– কিছু ভয় নেই তবে দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ– তুমি এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। ঘুম ভেঙে গেল। শরীর আমার থরথর করে কাঁপছে। বেগম সাহেবাকে জাগালাম এবং স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি তক্ষুনি আমাকে এবং ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমার ভগ্নীপতি ফারুখ সাহেবের বাসায় চলে গেলাম। সেই সময় তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের হেড হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। ফারুখ সাহেবের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলাম এবং তিনি উপদেশ দিলেন যে তারই কলিগ অর্থাৎ সহকর্মী প্রফেসর ড. সৈয়দ আলী আশরাফ আধ্যাত্মিক জগতে অনেকটা অগ্রসরমাণ এবং করাচির নামকরা পীর বাবা জাহিন শাহ তাজির প্রধান শিষ্য– তার সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালো হবে। তাই করা হলো এবং আলী আশরাফ সাহেব পুরো বিবরণ শুনে আমাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ P.E.C.H.S.-এ তাঁর পীরের মজলিসে গেলেন। বাবা জাহিন শাহ তাজির মজলিসে প্রায় শ দুয়েক লোক উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই জিকিররত অবস্থায়

www.pathagar.com

ছিলেন। প্রধান রাস্তা থেকে শুরু করে, বাড়ির অঙ্গন, দোতলার সিঁড়ি হয়ে মূল বৈঠকখানার মেঝেতে স্থাপিত বাবার গদি (পবিত্র আশন) পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। আমাদের গরজ বেশি তাই ঠেলেঠুলে অন্যদের অসুবিধা ঘটিয়ে বেয়াদবি করেই আমাদের যেতে হলো এবং এক ফাঁকে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। বাবা জাহিন শাহ নজদিগ যেতে বললেন এবং আমাকে দেখে ইংরেজিতে বললেন, 'তুমিতো ভালো মানুষ– তোমার ক্ষতি কে করবে এবং কেনই বা করবে? যাও নিশ্চিন্ত থাকো তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না।' তিনি একান্তভাবে মিনিট দুই সৈয়দ আলী আশরাফের সাথে কথা বললেন এবং আমরা উভয়েই বাবা জাহিন শাহ তাজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় আলী আশরাফ সাহেব আমাকে বললেন যে, আগামী পর পর দুই শুক্রবার আমার 'ঘর বান্ধা' হবে অর্থাৎ আমার বাসস্থানের ভেতরে কিছু দোয়া দরুদ এবং বাইরে তোয়াব করার মতো দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে কয়েকটি চক্কর দিতে হবে। এর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তিনিই করবেন। ঘর বান্ধা শেষ হলেই আমি ঘরে উঠতে পারব। সুধী পাঠক নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, আমার এই অভিযানে কোনো ফল হয়েছিল কি না। বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, আমি সম্পূর্ণভাবে অভিশাপমুক্ত হয়েছিলাম।

লন্ডনের পথেই ফিরে আসি। বর্তমানের মিসেস আলী ১৯৬৬ সালের সেই প্রফেসর আলী আশরাফের শ্যালিকা। বর্তমানে লন্ডনে স্থায়ীভাবেই থাকেন এবং লন্ডনে গেলে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হয় ড. এবং মিসেস মোহার আলীর সাথে। মোহার আলী সাহেব ইতিহাসে ডক্টরেট এবং 'দ্য হিস্টরি অব মুসলিম বেঙ্গল'-এর লেখক। বর্তমানে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন এবং বেশ "Advance stage"-এ রোগ সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থাতেও তিনি রাতদিন খেটেখুটে আল কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ এবং তৎসহ সংক্ষিপ্ত তাফসির রচনায় জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেয়ার মনস্থ করেছেন। জীবনে তার বর্তমানে একটাই প্রার্থনা যেন পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে এই কুরআন তাফসির গ্রন্থটি অনুবাদ করার তৌফিক দেন।

মিসরীয় ইমাম ড. ফাহিম স্যুট-কোট পরিহিত এবং সম্পূর্ণভাবে দাড়ি-গোঁফ মূর্তি অবস্থায় শুক্রবার ইমামতি করতে আসেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে সাউথ উডফোর্ড মসজিদে তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতি শুক্রবার খোৎবা দিয়ে থাকেন। এই খোৎবা শোনার জন্যই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসল্লিরা এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন। ধারাবাহিকভাবে কুরআন-হাদিসের আলোকে এমন চমৎকার ভাষণ দেন

www.pathagar.com

যে কেবল শুনতেই ইচ্ছে করে। মসজিদটিতে স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে এক জামায়াতে তিনশত মুসল্লির বেশি নামাজ পড়া যায়। প্রথম জামাতে খোৎবা দেন ড. ফাহিম তাই প্রথম জামাতে সকলেই শরিক হতে চান। প্রথম জামাতে শরিক হতে হলে একটু আগেই যেতে হয়। মসজিদটি সাউথ উডফোর্ড, উডফোর্ড, লাউটন এবং আরো কয়েকটি স্থানের মুসল্লিদের একমাত্র মসজিদ। আজ ইমাম সাহেব জিহ্বা সম্বন্ধে বললেন। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে জিহ্বাকে কঠিনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা তিনি দিলেন।

নামাজের পর রাস্তায় দাঁড়িয়েই চেনা পরিচিত বাংলাদেশীরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে থাকে। খবরাখবর আদান-প্রদান করে থাকে। এটাই যেন রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকেই মেলামেশার সুযোগ লাভের জন্য প্রতি শুক্রবার এখানে আসেন।

আজ সারাটা দিনই কাটালাম আনসার সাহেব ও জেনীদের সাহচর্যে। আনসার সাহেব ও জেনী একদিকে সম্পূর্ণ মডার্ন আবার অন্যদিকে বাঙালিত্ব রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। সব বাঙালির সাথেই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেন। তাদের বাসায় গেলে ভুড়ি ভোজন না করে রেহাই পাওয়া যায় না। কখন যে জেনি একক অতিথি কমোডোর খালুর জন্য নানা পদের রান্নাবান্না করেন তা শুধু অন্তর্জামীই জানেন। শুক্রবারটা আমার প্রায়ই তাদের সাথে অতি আন্তরিকভাবে কাটে বলে লন্ডনে থাকলেই শুক্রবারের দিকে চেয়ে থাকি।

www.pathagar.com

এগার.

উইন্ডসর ক্যাসেল

ইংল্যান্ডে সপ্তাহে দু দিন ছুটি করে এবং পাঁচ দিন অতি নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। শনিবারের ছুটি তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে কাটায়। এই দিন সংসারের কেনাকাটা, বাগান পরিচর্যা করা থেকে শুরু করে যাবতীয় ঘরবাড়ি মেরামত করার কাজ হাতে নেয়। পুরো সপ্তাহের রুটিন যেসব কাজ ভাবা যায়, যথা ছেলেমেয়েদের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া, লাইব্রেরি থেকে বই আনা ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। এরপর হয় কোথাও বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে, বাইরে কোন রেস্তোরাঁতে খাওয়া-দাওয়া করে কিংবা ঘর থেকে স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিয়ে যায় এবং কোথাও কোনো উদ্যানে, নদীর কিংবা লেকের ধারে কোনো পিকনিক স্পটে বসে খাওয়া-দাওয়া করে এবং পুরো পরিবার নিয়ে দিনটি উপভোগ করে। ঘরে ফেরার আগে কোথাও কোন রেস্তোরাঁয় রাতের আহার শেষ করে ঘরে ফেরে। শ্রান্ত, ক্লান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে অলসভাবে সোফাসেটে গা এলিয়ে দেয় এবং টেলিভিশন প্রোগ্রাম উপভোগ করে। রোববার চার্চ দিবস। অনেকেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ চার্চে যায় এবং সেখানে গিয়ে সাপ্তাহিক মিলন পর্বটি উপভোগ করে চার্চ অনুষ্ঠানের পর একটু শেরিতে গলা ভেজায় এবং তারপর হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফেরে। সাধারণত শনিবার রাত এবং রোববার রাতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। শনিবার রাত সাধারণত হইচইয়ের রাত। পরদিন ছুটি তাই শ্রমিক শ্রেণী এই রাতে লোকাল পাব (সরাইখানা) এবং অন্য ছোটখাটো হোটেলে গিয়ে মদ্যপান এবং সেক্স ওয়ার্কার কিংবা সেক্স শিল্পীদের সাথে সময় কাটায় এবং আনন্দফুর্তি করে। শনিবার গভীর রাতে তাই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকরা দুর্বৃত্তায়নের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোয় না।

www.pathagar.com

শনিবার সুধীসমাজভুক্ত লোকরাও সন্ধ্যাটা বড় হোটেল পার্টি কিংবা নিজস্ব গৃহে বন্ধুবান্ধবের সাথে আরাম-আয়েশেই কাটায় এবং রাত ১০টার মধ্যেই তাদের কার্যক্রম শেষ করে। সোম থেকে শুক্র এই পাঁচটি দিনের ধকল সওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে রোববার রাত সাধারণত সবই নিজ নিজ গৃহেই কাটায় ।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে ইংল্যান্ডের সমাজব্যবস্থায় আনন্দ, উল্লাস এবং কাজকর্ম ও কর্তব্যবোধের সংস্কৃতির একটা রূপরেখা তুলে ধরলাম। আজ শনিবার তাই বীথি বলল যে, পায়ে হাঁটার কার্যক্রম আজ শনিবারটাতে বন্ধ রাখতে হবে। আজ ১৯ জুলাই ২০০৩। সবাই মিলে আমরা উইন্ডসর ক্যাসেল দেখতে যাব। উত্তম প্রস্তাব। আমি সম্মত হলাম। দিনটিও ছিল ঝকঝকে সুন্দর । উইন্ডসর ক্যাসেলে যাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট দিন।

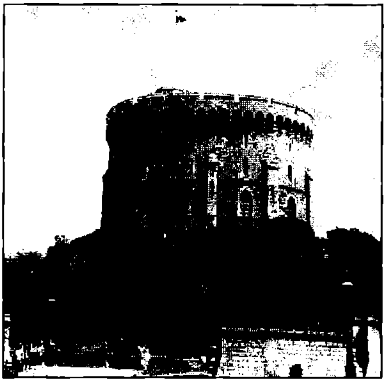

উইন্ডসর ক্যাসেল

এই দিনে ৪৬ বছর আগে আমার কনিষ্ঠা কন্যা দীপ্তি লন্ডনেই উলউইচ মিলিটারি হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়, তাই প্রথমেই তাকে একটা "ই মেইল" করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকাল ১০টার দিকে উইন্ডসরের পথে নামলাম। ৩০-৪০ মাইল রাস্তা আস্তে-ধীরে যেতে সময় লাগল ঘণ্টাখানেক। কিন্তু দুর্গের কাছাকাছি কোথাও পার্কিংয়ের স্থান পাওয়া গেল না। প্রায় দেড় মাইল দূরে আমরা গাড়ি রাখার স্থান পেলাম। ইংল্যান্ডে বর্তমানে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত। গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান মোটেই পাওয়া যায় না। গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এক-দুই মাইল পথ প্রায় সবাইকে হাঁটতে হয়। এতে বোধহয় পরোক্ষভাবে ইংরেজদের লাভই হয়। শারীরিক পরিশ্রমের দরুন কিছুটা চর্বি গলে এবং কোলস্টেরল কম হয়। অগত্যা আমরাও অতটা দূরেই গাড়ি পার্ক করে ধীরে ধীরে পাহাড় বেয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে চললাম।

www.pathagar.com

আমার খোঁড়া পা কিন্তু বুকে বল, তা-ই আমার সম্বল। এ নিয়েই আমি তিন বছর ধরে বিদেশ ভ্রমণ করে আসছি। আগস্ট ২০০২ সালে মাল্টা, জানুয়ারি ২০০৩ সালে ভারত, নভেম্বর ২০০৩ সালে নেপাল ভ্রমণের সময় একদিকে ব্যথায় কাতরিয়েছি অন্যদিকে ব্যথা উপশমের ওষুধ খেয়ে এবং গরম পানির সেঁক দিয়ে কষ্ট লাঘব করেছি। কিন্তু পথ চলেছি। পথ চলা যে আমার নেশা। বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ কাহিনীর ওপর লিখিত আমার বইতে এসব বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা আছে। আজও আমার কষ্ট হবে জানি তবু নতুনের সন্ধানে আমি পা টেনে টেনেই চলছি।

আমাদের গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান থেকে দুর্গটির পথের দু পাশেই খেলার মাঠ এবং শনিবার বলে সবারই আজ আনন্দ উপভোগের জন্য বেরিয়েছে। রোদ উঠেছে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাই গরমটাও পড়েছে বেশ। আমাদের সেদিকে খেয়াল করার সময় নেই আমাদের কাফেলা চলছে ধীরগতিতে।

প্রায় শখানেক ফিট উঁচুতে আমরা এক চত্বরে পৌঁছলাম। এখানকার কাউন্টার থেকে আমাদের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হবে। টিকিটের হার ছিল জনপ্রতি ১১৫০ টাকার সমপরিমাণ পাউন্ড স্টার্লিং। আমরা টিকিট কেটে ধীরে ধীরে কেল্লার দিকে অগ্রসর হলাম। প্রাসাদ চত্বরে গিয়ে প্রথমেই মূল প্রাসাদে প্রবেশ করার লাইনে দাঁড়ালাম। প্রাসাদ দেখে আমরা রানীর পুতুল ঘরে যাব। তৎপর বেরিয়ে এসে রানীর বাসভবন সংলগ্ন যেসব এলাকা দেখার অনুমতি আছে তা দেখব বিশেষ করে যে অঞ্চল অগ্নিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেগুলো দেখব এবং তারপর বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত উদ্যানে বসে কিছু পানাহার করব এবং পরিশেষে কেল্লা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার আগে সেন্ট জর্জ চ্যাপেল দেখব। এতে আমাদের সময় লাগবে প্রায় ৩ ঘণ্টা।

প্রায় ১০০০ বছর আগে উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার ১০৬৬ সালে হেস্টিংসের যুদ্ধে স্যাক্সনদের পরাজিত করে লন্ডন শহরকে পশ্চিম দিক থেকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তার বিজয়ী সৈন্যদের দিয়ে এই দুর্গের কাজ হাতে নেন। সৈন্যদের দিয়ে টেমস নদীর তীরে পাহাড়ের চূড়ায় এই ক্যাসেলটি অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি করেন। এই দুর্গটি হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুর্গ যা বর্তমানেও নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা আজ এখানে এসেছি এবং দুর্গ চূড়ায় দেখতে পাচ্ছি রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পতাকাও পত পত করে উড়ছে। তার মানে রানীও আজ এখানেই আছেন। বাকিংহাম প্যালেস এবং এই দুর্গটিতে রানী পালা করে করে

www.pathagar.com

থাকেন। সাধারণত রানী ইস্টারের ছুটি এবং জুন মাসের কয়েক দিন এখানে কাটান, তা ছাড়া মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তে এই সুন্দর দুর্গের ভেতরের প্যালেস তাঁকে আকর্ষণ করে। বাইরে থেকেও এর দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

বার্কশায়ার কাউন্টিতে সবুজ পাহাড়ের ওপর ধাপে ধাপে সাজানো সবুজ বাগান এবং পাহাড়টির চূড়াতে এই দুর্গটি স্ফিংসের মতো এ এলাকাটির ওপর খবরদারি করছে। লন্ডনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাইল ৩০ দূরে এই দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছিল লন্ডনের পশ্চিম পাশটা রক্ষার জন্য। স্যাকসনদের রাজত্বকালে (৮০২-১০৬৬) এই দুর্গের পাশেই গভীর জঙ্গল ছিল এবং সমগ্র এলাকাই ছিল রাজরাজড়াদের হান্টিং গ্রাউন্ড অর্থাৎ শিকার খেলার জন্য বরাদ্দকৃত অঞ্চল। এই দুর্গটি ১০০০ বছর ধরে ইংল্যান্ডের রাজা-রানীদের আবাসভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই বিভিন্ন নৃপতি এসে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয় স্যাক্সনদের রাজত্বকাল এবং শুরু হয় নরমানদের যুগ। উইলাম দ্য কঙ্কারার ও পরবর্তী রাজারা এই প্রাসাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং সাথে সাথে আরো শক্ত দেয়াল দিয়ে প্রাসাদকে মজবুত করেন। রাজকীয় আবাসিক অঞ্চলে ছোট-বড় অনেক কামরা তৈরি করেন, যা এখনো রাজ কার্যে ব্যবহৃত হয়। তার পর বেশ কিছু দিন এই প্রাসাদ অব্যবহারে পড়ে থাকে। এভাবেই ইংল্যান্ডের ইতিহাস ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এগিয়ে চলে এবং তারপর স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডের সাথে সংযুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

১৭৬০ সালে তৃতীয় জর্জ আবার কিছু সংস্কারকাজ হাতে নেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার সময় থেকেই এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দৃষ্টি কাড়ে।

সেন্ট জর্জ হল যা গথিক স্টাইলে নির্মিত তা প্রায় স্থানীয় ৩০০ ওক বৃক্ষ দিয়ে নির্মিত হয়েছে। কথিত আছে যে রাজা আর্থার যখনই কোনো যুদ্ধে যেতেন তখন সব যুদ্ধ পরিচালনায় ন্যস্ত সমরনায়কদের এই হলটি অতিক্রম করে যেতে হতো। একটা অষ্টভুজ কক্ষ রয়েছে এখানে যাকে বলা হয় ল্যান্টার্ন লবি। এর নির্মাণ কৌশলও দর্শনীয়। এই গৃহটিও গথিক স্টাইলে নির্মিত কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ওক গাছের কাঠ টকটকে লাল কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে সিলিংটাকে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। শত বর্ষ পুরনো এখানকার ঝারবাতিটি ১৯২০ সালে পুনরায় রানী মেরি এখানে প্রতিস্থাপন করেন। স্টেট ডাইনিং রুম এবং সবুজ ড্রইং রুম অত্যন্ত চমৎকার। ১৯৯২ সালে এই প্রাসাদটির ২১ নম্বর রুমে (ল্যান্টার্ন লবি) আগুন লেগে যায় এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন অনেক মূল্যবান সংগ্রহ ও আসবাবপত্র আগুনে

www.pathagar.com

পুড়ে যায়। ৫টি বড় বড় কক্ষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৯টি স্টেট রুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রাসাদটিকে পুনরায় সংস্কারের মাধ্যমে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ৪ বছরেরও অধিক সময় লাগে এবং ২০ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে রানী ও ডিউক অব এডিনবরা (রানীর স্বামী) পুনরায় প্রাসাদটি এক জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কারকার্য সম্পন্ন হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। সংস্কারকাজে ব্যয় হয়েছিল ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং এই টাকার অধিকাংশই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়।

এই প্রাসাদটি অনেক ব্যাপারেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর স্টেট ডাইনিং হল, সবুজ ড্রইং রুম, ক্রিমসন রঙের ড্রইং রুম অষ্টভুজ ডাইনিং রুম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রানী মেরির পুতুল ঘর ১৯২৪ সালে তৈরি করা হয় এবং ১২ ভাগের ১ ভাগ স্কেলে প্রতিটি মানুষ এবং দ্রব্যকে তৈরি করা হয়েছে। এখানে পানির কল এবং অন্যান্য দ্রব্যগুলো চালু অবস্থায় আছে। সেই পুরনো ঘড়িটি এখনো ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়মিত ঘণ্টাধ্বনি দেয়। এই গৃহটি অতি বাস্তব বলে মনে হয়। ছাদের নিম্নভাগের পেইন্টিং, দেয়াল পেইন্টিং, শ্যান্ডিলিয়ার এবং অন্যান্য বাতিগুলো দেখে মনে হয় যেন এই ঘরে লোকজন বসবাস করছে। পুতুলঘরটি তৈরি করতে ১০০০ও বেশি দক্ষ কারিগরের তিন বছর কাজ করতে হয়েছিল। এখানে সর্বমোট ২০৬টি পুতুল রয়েছে এবং এই পুতুলগুলোর অনুরূপ পুতুল তৈরি করে বিক্রি করা হয়। বাইরে দোকানে দোকানে ডজনের পর ডজন কিনতে পাওয়া যায় এবং একটা রয়ালটি প্রাসাদের কোষাগারে জমা হয়।

শত শত বছর ধরে এই দুর্গটি একাধারে লন্ডনের পশ্চিম প্রান্তে প্রতিরোধ ব্যূহ এবং অন্যদিকে রাজকীয় প্রাসাদ হিসেবে বিরাজ করছে। হ্যামটন কোর্ট ও লন্ডনের কাছেই আর একটা প্যালেস কিন্তু সেখানে কোনো রাজা-রানীই বর্তমান যুগে থাকেন না। কিন্তু এই প্রাসাদটি ভিন্ন। এখানে বছরে অন্তত দুবার রানী এসে কয়েক দিন ছুটি উপভোগ করেন। রাজা-রানীদের জীবনধারা কেমন তা এই প্যালেস দেখবার পর অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই ছেলেপেলে নিয়ে এই দুর্গে অনেকেই আসে, যাতে রাজা-রানীদের জীবন-ধারার একটা চিত্র দেখে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

১৪৭৫ সালে নির্মিত সেন্ট জর্জ চ্যাপেলটি দেখার মতো। এখানে প্রায় ১০ জন রাজা-রানীর সমাধি রয়েছে। আজ শনিবার, তাই আমরা চ্যাপেলে প্রবেশাধিকার পেলাম। রোববার খ্রিস্টানদের আরাধনার জন্য এই চ্যাপেলটি দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকে।

www.pathagar.com

দুর্গের ওপর প্রাসাদ চত্বর থেকেই মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ইটন কলেজ দেখা যায়। ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজা ষষ্ঠ হেনরি এই স্কুলটি নির্মাণ করেন। নির্মাণের সময় মাত্র ৭০ জন ছাত্রই এখানে পড়তে পারত। বর্তমানে এখানে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের প্রায় ১৩০০ ছাত্র পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ স্কুলটির স্থপতি ছিলেন রাজা ষষ্ঠ হেনরি কর্তৃক নিয়েজিত স্যার ক্রিস্টোফার রেন। বর্তমানে এই স্কুলটি মর্যাদার দিক থেকে বিশ্বের সেরা স্কুলগুলোর অন্যতম। ইটনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, ইটন থেকে ১৯ জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন পরিমণ্ডলে ইটন বিশেষ অবদান রেখেছে। চতুর্থ এডওয়ার্ড যখন ১৪৬১ সালে ষষ্ঠ হেনরিকে অপসারণ করলেন তখন এই বিখ্যাত স্কুলটির সমস্ত সুবিধা কর্তন করে দেন। এডওয়ার্ডের এক প্রেমিকা রাজার সাথে দেনদরবার করে ইটনকে পুনরায় চালু করতে সক্ষম হন।

১৪৮৫ থেকে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়েলস্ থেকে আগত টিউডর রাজবংশের মাত্র পাঁচজন নৃপতি ইংল্যান্ড শাসন করেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো সপ্তম হেনরি (১৪৮৫-১৫০৯), তাঁর পুত্র অষ্টম হেনরি (১৫০৯-১৫৪৭) এবং তার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড (১৫৪৭-১৫৫৩)। তৎপর তার সৎ বোন মেরি (১৫৫৩-১৫৫৮) এবং তার ছোট বোন রানী প্রথম এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩)। টিউডর যুগেই ইংল্যান্ড রেনেসাঁর (পুনর্জাগরণের) ছোঁয়া পায়।

টিউডর যুগ শেষ হয় সন্তানহীন অবস্থায় রানী প্রথম এলিজাবেথের পরই। তার পর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন স্কটল্যান্ডের ষষ্ঠ জেমস্ এবং এভাবেই সংযুক্ত হয় ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড।

ইতিহাসের চর্চা আর অধিক দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তাহলে হয়তোবা সুধী পাঠক আমাকে ছেড়ে কোনের আইসক্রিমের দোকানে গিয়ে বসে পড়বেন। বাস্তবেও তা-ই হয়। দুর্গ দেখা বেশ পরিশ্রমের কাজ, বিশেষ করে আমার মতো পর্যটক যারা, যেখানে যতটুকু পায় তাই শুষে নিতে চায়। পরে পাঠকের খেদমতে উপস্থাপনের জন্য। তাই আমি যখন বেরোই তখন দেখতে পাই আমার সহযাত্রীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় দফার আইসক্রিমের অপেক্ষায় রয়েছে। আমার আইসক্রিমের প্রতি লোভ যথেষ্টই আছে কিন্তু খাওয়া বারণ ব্লাড সুগার এবং ভুঁড়িটা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে।

আমরা এগিয়ে চললাম পুরো পথটাই এখন ঢালু, তাই চলার কষ্ট কম। এক সময় আমাদের পায়ে চলার পথ শেষ হলো এবং আমরা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললাম লন্ডনের দিকে।

www.pathagar.com

বার.

এপিং ফরেস্ট

কয়েক দিন ধরেই ক্রমাগত হেঁটে বেড়িয়েছি লন্ডনের কোনো না কোনো অঞ্চলে। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তাই ভাবলাম, আজ রোববার ছুটির দিনটাতে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই। কদিন পরই আমার কন্যা বীথির দ্বিতীয় বিবাহ, তাই তাকে আজ ছুটির দিনে বাজার করতে যেতে হবে এবং বিয়ের ব্যাপারে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই আমি মনস্থ করেছি যে, আজকের দিনটা শুয়ে-বসে ঘরেই কাটিয়ে দেব।

বেলা ১১টার দিকে জেনি ও তার স্বামী আনসার সাহেব এসে উপস্থিত। তারা আমাকে লন্ডনের বিখ্যাত কয়েকটা নার্সারি গার্ডেনে নিয়ে যেতে চায় এবং তারপর এপিং ফরেস্ট দেখাতে চায়। উত্তম প্রস্তাব, তাই সানন্দে আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে পর্যটকসুলভ মনোভাব নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বিখ্যাত এপিং ফরেস্ট বাসা থেকে মাত্র মাইল তিনেকের পথ। প্রাচীনকালে এই অরণ্য বিস্তর এলাকাজুড়ে বিরাজ করত এবং এটা ছিল বন্য পশুদের অভয়ারণ্য। সেকালে ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম হেনরি একটি বনের অভ্যন্তরে শিকার খেলা ও অবলোকনের জন্যে একটি রাজকীয় কুটির নির্মাণ করেন। প্রায় ৪০ বছর পর ১৫৮৯ সালে রানী প্রথম এলিজাবেথ এই কুটিরের সংস্কার করেন। বর্তমানে সেই কটেজ অর্থাৎ কুটিরটিকে চিংফোর্ডে রাস্তার ধারে উন্মুক্ত মাঠেই দেখা যায়। সে আমলে রাজা-রাণীরা সমগ্র অরণ্যের মালিক হতেন এবং জন সাধারণকে তাদের গৃহপালিত পশুচারণের অধিকার দিয়ে দিতেন। তার বহুকাল পর বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ রাজার কাছ থেকে ভূমি ইজারা নিয়ে, সীমানা চিহ্নিত করে ছোট-বড় অনেক ব্যক্তিগত খামার সৃষ্টি করলো এবং জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে

www.pathagar.com

দিল। এতে স্বভাবতই জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলো এবং তারা আপত্তি জানাল। এর ফলে বৃহত্তর লন্ডন করপোরেশন ১৮৭৮ সালে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থে এপিং ফরেস্ট আইন নামক এক আইন প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং এই অরণ্যকে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সেই আইনে এটাও উল্লেখ থাকে যে, এখানে কোন প্রকার চাষাবাদ করা যাবে না, কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না, কোনো প্রকার শিকার করা যাবে না এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করা যাবে না যদিও ঝড়ে কিংবা কোনো প্রাকৃতিক কারণে কোনো বৃক্ষ পড়ে যায়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়া সাধারণ জনগণের আনন্দ ও বিনোদনের জন্য এপিং ফরেস্টে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

এপিং ফরেস্ট আইন হওয়ার আগেই ডেবডেন, লাউটন, চিগওয়েল এবং এরূপ স্থানে লোকবসতি গড়ে ওঠে। তাই বর্তমানে চিংফোর্ডে অরণ্যের বাইরে দেখা যায় রানী এলিজাবেথের হান্টিং লজটি। ১৮৭৮-এর আইন হওয়ার পর অবশ্য অরণ্য পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হলো। বর্তমানে এপিং ফরেস্টের আয়তন ৬০,০০০ একর, দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৪ কিলোমিটার। জনগণের সুবিধার্থে এই বনে নানা স্থানে ছোট ছোট পার্ক তৈরি করে রাখা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মোটর চলার উপযোগী পাকা রাস্তা রয়েছে এবং নানা স্থানে দর্শনার্থীরা এসে পানাহার করতে পারে এরূপ কফি বার, টি-স্টল এবং পাব (যেখানে মদ্যজাতীয় পানীয় পরিবেশন করা হয়) তৈরি করে রাখা হয়েছে। পায়ে হেঁটে বেড়ানোর জন্য বিভিন্ন এলাকায় ক্লাব রয়েছে। তারাই বলে দেয় কোনো রাস্তায় গেলে কতটা পথ হাঁটা হবে কী কী দেখা যাবে। কোনো বড় শহরের সন্নিকটে এত বড় বিনোদন পার্ক বিশ্বের আর কোথাও নেই। এই নিয়ে লন্ডনবাসীরা গর্ব অনুভব করে। প্রতিদিন এই পার্কে অসংখ্য লোক আসে, বহু পরিবার এখানে এসে নিশ্চিন্তে সারাটা দিন কাটিয়ে যায়।

এপিং ফরেস্টের তিন ভাগের ২ ভাগ অঞ্চল হচ্ছে বনাঞ্চল এবং বাকি ১ ভাগে রয়েছে জন সাধারণের ভোগের এবং বিনোদনের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট উদ্যান ৪০টি ফুটবল খেলার মাঠ, একটা ১৮ হোলবিশিষ্ট গলফ কোর্স, তিনটি ক্রিকেট খেলার মাঠ, বহু পায়ে হাঁটার রাস্তা, শৌখিন ঘোড়সওয়ারীদের জন্য ঘোড়া চালানোর রাস্তা, (ভাড়ায় এখানেই ঘোড়া পাওয়া যায়) ৮০টি কৃত্রিম জলাশয় যেখানে নানা ধরনের হাঁস বিচরণ করছে এবং এই সব জলাশয়ে বড়শি দিয়ে মাছও ধরা যায়। এই অরণ্যে বহু প্রকৃতির পাখি পাওয়া যায় এবং ৬৫০ রকমের উদ্ভিদের সন্ধান মেলে।

www.pathagar.com

এই পার্কটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। পার্কটি এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে, সরকার ব্রিটেনে এই পার্কটিতে প্রতি বছরই গ্রিন ফ্ল্যাগ পুরস্কার প্রদানপূর্বক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে।

এতদসত্ত্বেও এই পার্কের উন্নতির জন্য প্রতিবছরই অনেক অর্থ ব্যয় করা হয় এবং এর ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য এটাকে হেরিটেজ পার্কের (উত্তরাধিকারীদের পার্ক) মর্যাদা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে কর্মকর্তাগণ পারিপার্শ্বিক জনসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করেই উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করে থাকে। যারা এই অরণ্যে দিন কাটাতে যান তাদের কাছে থেকেও পরামর্শ চাওয়া হয়। আবেদন করা হয় যে, এই অরণ্যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি এবং দোষ-ত্রুটি নজরে এলে যেন নির্দ্বিধায় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়।

লন্ডনে গেলেই কোনো না কোনো সুযোগে এপিং ফরেস্টের মধ্য দিয়ে একবার ড্রাইভ করে যেতে ইচ্ছে করে। বনের মধ্য দিয়ে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে নির্জন রাস্তায় ড্রাইভ করে এলে মনটা সতেজ হয় তবে এবারই সত্যিকার অর্থে এক পার্কের ধারে গাড়ি দীর্ঘ সময়ের জন্য থামিয়ে পায়ে হেঁটে বনে বিচরণ করলাম এবং বনের অভ্যন্তর সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করলাম। এটা আমাদের দেশের সুন্দর বন কিংবা আফ্রিকার ঘন জঙ্গলের মতো নয়। এখানে গাছগুলো ২০-২৫ ফিট দূরে দূরে অবস্থিত, যেন মনে হয় লাইন ধরে লাগান হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশেই এসব গজিয়ে উঠেছে এবং বড় হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এই অরণ্যে বহু পায়ে হাঁটার পথ রয়েছে এবং এগুলো সবই চিহ্নিত এবং প্রায় প্রতিটিই ৩ থেকে ৪ মাইল লম্বা অর্থাৎ দেড়-দু ঘণ্টার যাত্রাপথ। রাস্তাগুলো তৈরিও করা হয়েছে এমনভাবে যে কখনো ঝিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কখনো গাছগাছালির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কখনো নিচের দিকে এবং কখনো বা ওপরের দিকে যাচ্ছে। গতিপথে একটা বৈচিত্র্য আছে তাই পথ চলতে আনন্দই লাগে। দেখলাম অনেক বড় গাছ ধরাশায়ী। মনে হয় এদের সরিয়ে নেয়া কিংবা উদ্ধার করার কেউ নেই। বাস্তব হচ্ছে যে, বনকে বনের মতোই প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে দেয়াই এদের নীতি। আমাদের দেশে ভাওয়াল অঞ্চলে দেখেছি গাছের পাতা এবং গজিয়ে ওঠা ছোট ছোট গাছ, পাতাকুড়ানিরা পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে। পাতা পচে যে জৈব সার হবে সে সম্ভাবনা আর নেই। এতে স্বাভাবিক খাদ্য থেকে গাছ বঞ্চিত হচ্ছে এবং গাছের মান ধীরে ধীরে নিম্নগামী হচ্ছে। তাই যে মানের গজারি গাছের খাম্বা আমরা ছোটবেলায় ১৯৪০-৫০ দশকে দেখেছি সেই মানের খাম্বা বর্তমানে আর পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

বনের ভেতর থেকে ভ্রমণ শেষে বেরিয়ে এলাম। পার্কের কোণের দোকান থেকে চা কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি এমন সময় সামান্য দূরে দেখলাম এক ভদ্রলোক লোহার খাঁচা থেকে এক একটা করে পাখি বের করছে এবং তা শূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারখানা কি তা জানার অদম্য আগ্রহ মনে জাগল। কৌতূহল নিবারণের জন্য তাই সেদিকে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে, পাখিগুলো কবুতর। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম এই পাখিগুলো ছেড়ে দেয়ার হেতু কী? উত্তরে তিনি বললেন, এগুলো বিশেষ ধরনের পায়রা যাকে বলা হয় 'হোমিং পিজিয়ান' জিজ্ঞাসাবাদের পর আরো জানলাম যে, এ পায়রাগুলোকে কিছুদিন পর অনুষ্ঠিতব্য একটা পায়রা রেইস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। হোমিং পায়রার ধর্ম হচ্ছে যে, যেখান থেকেই এই পায়রা মুক্তি পাবে সেখান থেকেই সোজা তার বাড়িতে দ্রুততম বেগে উড়ে চলে যাবে। আর ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে হচ্ছে বাস্তবে পরীক্ষা করা যে, এটা সত্যি সোজা উড়ে বাড়িতে চলে এলো কি না। বাড়ি এদের চিনিয়ে দেয়া হয়েছে। বাড়ি হচ্ছে তার খোপ যেখানে পায়রাটি রাত কাটায়। বাড়ি পরিবর্তন করা অর্থাৎ পায়রাসহ খোপটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। শেষ স্থানটিই অর্থাৎ খোপটি যেখানে সরিয়ে এনে রাখা হলো সেই স্থানটিকে ভালো করে চিনিয়ে দিলেই সে তার খোপে চলে আসবে। প্রথম প্রথম ১০০-২০০ গজ দূর থেকে ট্রেনিং চলতে থাকে এবং তার বাড়ি অর্থাৎ খোপে পৌছলেই তার প্রিয় খাদ্য দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়ানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৬০০-৭০০ মাইল দূরে ছেড়ে দিলেও পায়রা ঠিকই তার খোপে পৌঁছে যাবে।

বর্তমানে ট্রেনিংয়ের প্রায় শেষ পর্যায়। যে স্থানে বিচারকমণ্ডলী বসবেন এবং এই রেইসের প্রথম, দ্বিতীয় এবং অন্যান্য স্থান নির্ধারণ করবেন সেই স্থানটিতেই বিভি-ন্ন প্রতিযোগীর পায়রার খোপ রাখা হয়েছে। সেই স্থানটি স্কটল্যান্ডে এবং রেইস শুরু হবে লন্ডন থেকে। একটা নির্দিষ্ট সময় বিচারকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে পায়রা ছাড়া হবে। অন্য এক বিচারকের দল শেষপ্রান্তে অর্থাৎ স্কটল্যান্ডে পায়রার আগমনের অপেক্ষায় থাকবে এবং যেসব পায়রা লন্ডন থেকে উড়ে এলো তাদের আইডেনটিটি পরীক্ষা করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নির্বাচন করবেন।

হোমিং পিজিয়নকে আরো বিভিন্ন প্রকারে ট্রেনিং করা যেতে পারে। সিনেমার পর্দায় আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকতে পারেন যে, সংবাদ পরিবহনের ক্ষেত্রে কিংবা প্রেমপত্র পাচারের ব্যাপারে পায়রার ব্যবহার ওগুলোই হচ্ছে হোমিং পায়রা।

www.pathagar.com

হোমিং পায়রা সম্বন্ধে আরো তথ্য দিতে গিয়ে ভদ্রলোক জানালেন যে, হোমিং পায়রা এক উড়ানে কোথাও না থেমে ৬০০-৭০০ শত মাইল চলে যেতে পারে। পায়রার গতি সাধারণত ঘণ্টায় ৬০ মাইল হয়ে থাকে। দিক নির্ণয়ের জন্য পায়রা চোখের দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল নয়। তারা সূর্যের অবস্থান এবং বিশ্বের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তির তারতম্য অনুভব করতে পারে এবং এরই ওপর ভিত্তি করে সঠিক দিক নির্ণয় করে উড়ে চলে। ভদ্রলোক বললেন যে, কিছুদিন পর ৬০০ মাইল দূরপাল্লার একটা রেইস হবে তারই জন্য তিনি এই পায়রাগুলোকে তৈরি করছেন।

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে হোমিং পিজিয়নের ক্লাব রয়েছে। একটা অ্যাসোসিয়েশনও আছে। তারাই এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

এপিং ফরেস্টে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘোরাফেরার পর আমরা জেনির অতি পছন্দের ফুলের গাছপালার নার্সারি দেখতে গেলাম। এত বড় নার্সারি আমি আগে কখনো দেখিনি। মনে হয় এই নার্সারিটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৪০০ এবং ৮০০ গজ হবে। প্রবেশপথেই সামনে নুড়ি পাথর বিছানো এক বিরাট অঙ্গন। অঙ্গনের প্রান্তে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। অঙ্গন পার হলেই প্রায় ৪০০ ফিট লম্বা এবং ৬০ ফিট প্রশস্ত গ্লাস হাউস শেড। ৩০ ফিট দূর দূর এরূপ আরো তিনটি শেড রয়েছে। এই শেডগুলোর ভেতরে থরে থরে নানা প্রকারের মৌসুমি ফুলের চারাগাছ, নানা বর্ণের বাহারী পাতার গাছ, চিরসবুজ পাতার গাছ, নানা ধরনের সাকুল্যান্ট অর্থাৎ ফোঁপালো উদ্ভিদ এবং হরেক রকম ক্যাকটাস অর্থাৎ কাটা জাতীয় উদ্ভিদ রয়েছে। অন্য শেডে রয়েছে বনসাঁই করা গাছ অর্থাৎ এমন বৃক্ষ যাকে অবাধে বাড়তে দেয়া হয় না। বাড়তে দিলে ৫০-৬০ ফিট উঁচু হবে। এই গাছকে বনসাঁই করে দেড় ফিটের মধ্যেই রাখা যায়। একটা প্রাপ্তবয়স্ক ৪০-৫০ বছরের দেড় ফিট উঁচু বটবৃক্ষের বিক্রয় মূল্য ৪০০-৫০০ পাউন্ড হতে পারে। বর্তমান পাউন্ডের মূল্য ১২০ টাকা হলে ওই ছোট বনসাঁই গাছটির মূল্য টাকায় ৫০-৬০ হাজার টাকা হবে। বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছের চাড়া দেখলাম এক শেডে। আর একটা শেডে দেখলাম গুল্মজাতীয় গাছে ভর্তি, আর একটাতে লম্বা ঘাসজাতীয় লতাপাতার গাছ রাখা হয়েছে। আমরা ৪টি শেডই ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং চোখের ও মনের তৃপ্তি পেলাম।

খুচরা মূল্যে শৌখিন ক্রেতারা দেখে দেখে পছন্দমাফিক গাছ কিনে এবং পরে এগুলো ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে নার্সারির কর্মচারীরাই গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। বড় বড় ট্রাকও সরাসরি শেডে ঢুকে যায় এবং ট্রাকভর্তি করে মালামাল কিনে নিয়ে যায় পাইকারি মূল্য। এক শেডের মধ্য দিয়ে অন্য শেডে যাওয়ার রাস্তা তাই

www.pathagar.com

সরাসরি যেকোনো শেডে ট্রাক পৌঁছে যেতে পারে এবং মাল বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারে কিংবা এই কোম্পানিরই নতুন মালামাল এন রিপ্লেনিশ অর্থাৎ খালি হয়ে যাওয়া মালামাল পূরণ করে দিতে পারে। এই খেলাই চলছে সারাটি দিন। কর্মব্যস্ততা দেখতে ভালোই লাগে। সব কেনাবেচা কম্পিউটারের মাধ্যমে হয় বলে রিপ্লেনিশমেন্টের দ্রব্যাদি তাদের মূল খামার থেকে সঠিকভাবে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠানো সম্ভব হয়।

একদম পেছনের শেড দিয়ে বাইরে বেরুলে দেখা যাবে কাঁকড় বিছানো উদ্যান এবং তারপরই বড় বড় পটে নানা ধরনের টিম্বার, ফল ও ফুলের গাছ। ১০ ফিট থেকে ২০ ফিট উঁচু এসব গাছ ২০০ পাউন্ড থেকে শুরু করে হাজার দু হাজার পাউন্ডে বিক্রি হচ্ছে। এগুলো সাধারণত বৃহৎ বাগানে রোপণ করা হয়। নতুন বাড়ির বাইরে প্রাঙ্গণে যদি তৈরি বাগান দেখতে চান তাহলে ১০-২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। ১০-২০ বছরের গাছ নিয়ে লাগালেই হবে। তবে পুরো সন্তুষ্টির জন্য ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট ও গার্ডেন প্ল্যানারের সাথে পরামর্শ করেই এসব গাছ লাগানো হয়ে থাকে– যাতে একটা গাছ লাগানোর পর পছন্দসই স্থানে হলো না বলে আবার সরাতে না হয়।

আমারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর আতিকুর রহমান রোমে (ইতালি) একটা সদ্য সমাপ্ত বাড়ি কিনেছে। বাড়ির চারদিকটা ছিল একদম ফাঁকা। কোনো প্রকার গাছগাছালি ছিল না। তাই সে প্ল্যান করে ফুল ও ফলের বড় বড় গাছ কিনে লাগাল এবং মাস ছয়েকের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের আপেল, আঙুর, নাশপাতির গাছে ফল ধরেছে দেখে এসেছি। বাড়িটা এখন অতি মনোরম বাড়ি বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কদিন আগেই ফাঁকা মাঠের মধ্যে অবস্থিত বাড়িটার কোনো আব্রু ছিল না, ছিল না কোনো আভিজাত্য। অথচ এখন চারদিকে বিভিন্ন প্রকারের ফুল ও ফলের বাগান, মাঠভর্তি ঘাস সব মিলে সবুজে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। বহিরাগত এই গাছগাছালি দেখে তৃপ্তিতে মন ভরে যায়।

লন্ডনের নার্সারিতেই ফিরে যাই। জেনি চলার পথে আশপাশে কিছুটা খোঁজাখুঁজির পরও তার শখ মেটানোর মতো বনসাই গাছটি পেল না। সব ধরনের বনসাই গাছই পাওয়া যায় তবে একটু খুঁজতে হতো। কিন্তু খালুকে নিয়ে অর্থাৎ আমাকে নিয়ে তাদের প্রয়োজনে ঘোরাফেরা করাটা তাদের শালীনতায় বাধল বলেই আমাকে নিয়ে আর একটা অঞ্চলে গেল।

এ অঞ্চলে দেখতে পেলাম বিভিন্ন ধরনের গাছ কেটে ছেটে বিভিন্ন আকৃতির করে রেখেছে। গুল্মজাতীয় গাছই এ কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। দেখলাম গরু, ঘোড়া,

www.pathagar.com

হাতি, পাখি, পিরামিড, জাহাজ ইত্যাদি বিভিন্ন আকৃতির বৃক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেতে পেলাম ২২-২৩ বয়েসের তরুণীরাই এই কাট-ছাঁট করার কাজ অনায়াসে করে যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে ইলেকট্রনিক করাত এবং কাটার। মেশিন চালিয়ে দিয়ে শুধু করাত কিংবা কাটার চালিয়েই আকৃতি মাফিক কাট-ছাঁট করা যায় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা তাই করছে।

বেলা বয়ে চলেছে। তাই ঘরে ফেরার তাগিদই বেশি অনুভব করলাম।

www.pathagar.com

তের.

মধ্য লন্ডনের সফর

আজ মঙ্গলবার ২২ জুলাই ২০০৩ সাল। গতকাল বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘরেই কাটিয়েছি। তাই আজ একটু বেশি পরিমাণ ঘুরাফেরার জন্য একটু সকাল সকাল তৈরি হয়েই বেরিয়েছি। আজ আমার পরিকল্পনা হচ্ছে সেন্ট্রাল লন্ডনের 'ব্যাংক' টিউব স্টেশনে যাওয়া এবং সেখান থেকে বিভিন্ন রাস্তা ধরে চলা এবং প্রাচীন লন্ডনের আদি-অন্ত খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো। পুরনো এবং নতুন স্থাপনাসমূহ দেখা এবং ওসব সম্বন্ধে টুকিটাকি জানা এবং মূল্যবান তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা।

ব্যাংক টিউব স্টেশন থেকে একটু পূর্বদিকে যেতেই দেখতে পেলাম থ্রেডনিড্‌ল্ স্ট্রিট। আর একটু দূরেই দেখতে পেলাম শসার আকৃতির একটা দালান। যেন শসাটা অর্ধেক কেটে ভূমির ওপর রেখে দেয়া হয়েছে। সব স্ট্রাকচারটাই গোলাকার। ভূমি থেকে যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই এটা সরু হয়ে এসেছে এবং একদম উপরিভাগ শসার মতোই গোলাকার। এই স্থাপনাটি নির্মাণ করছে SKANKA নামক একটা সুইস ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম। বর্তমানে এ ফার্মটার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে এবং বড় বড় কনস্ট্রাকশন কাজগুলো এ ফার্মই করে থাকে। কনস্ট্রাকশন এলাকায় বৃহৎ নোটিশ বোর্ডে দেখতে পেলাম ইংরেজিতে লিখা আছে যার অনুবাদ হচ্ছে– কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে শব্দ এবং ধুলো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং নিম্নতম পর্যায়ে থাকে। জনসাধারণের কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় এবং পথচারীদের চলার চথে কোন প্রকার বিঘ্নতার সৃষ্টি না হয়।

ব্যাংক থেকে থ্রেড নিড্‌ল্ স্ট্রিট, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ও গিল্ড হল হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিনস্‌ব্যারি সার্কাস পর্যন্ত এলাম। পায়ে হেঁটে পথচলার জন্য দিনটা আজ

www.pathagar.com

খুবই উপযুক্ত। মেঘলা আকাশ কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কখনো কখনো মেঘ চিরে হালকা রোদ বেরিয়ে আসে কিন্তু পরক্ষণেই আবার মেঘের আবরণে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। লন্ডনের রাস্তায় হাঁটার আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি রাস্তার পাশ দিয়েই আছে প্রশস্ত ফুটপাথ। অত্যন্ত পরিষ্কার করে রাখা হয়। কোনো প্রকার অবৈধ প্রতিবন্ধকতা নেই, লোকজনের ঠেলাঠেলি নেই, ফেরিওয়ালাদের চিৎকার নেই। তাই পথ চলে আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ফুটপাথগুলো যদি অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবৈধভাবে জবরদখল করে না নেয়া হতো তাহলে আমাদের দেশবাসীও পায়ে হেঁটে চলে আনন্দ পেত। এতে শরীর স্বাস্থ্যও ভালো থাকত এবং সাইকেল রিকশার ওপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস পেত।

ফিনস্‌ব্যারি সার্কাস সেন্ট্রাল লন্ডনে বেশ একটা খোলামেলা স্থান। এখানেও দুপুরের দিকে অফিস পাড়ার ভিড় জমে। নীরব পরিবেশে শান্তিতে কিছুটা সময় কাটানোর জন্যই এখানে লোকজন আসে। আমিও কিছুটা সময় বসে পা দুটেকে কিছুটা বিশ্রাম দিলাম। লোকজনের আনাগোনা আছে কিন্তু কোনো প্রকার হই চই নেই। এ পার্কটি ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটাকেই লন্ডনের সর্বপ্রথম পার্ক হিসেবে গণ্য করা হয়। লন্ডন ওয়ালের অভ্যন্তরে সর্ববৃহৎ পার্কও এটাই। ১৯০০ সালে লন্ডন করপোরেশন পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে এ পার্কটির দখলদারিত্ব নিয়ে নেয়। যে অঞ্চলে বসে আছি এটাই লন্ডনের আদি শহর। লন্ডনবাসীদের দিয়ে তৈরি হয়নি। তৈরি হয়েছে রোমানদের দিয়ে। সেই কালের রোমান শহরে বসে আকাশ পাতাল ভাবলে চলবে না তাই আবার পথ চলা শুরু করলাম। আজ আমি মুখ্যত বারবিকান সেন্টার দেখতে এসেছি। কিন্তু বারবিকান সেন্টার সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। ম্যাপে বারবিকান সেন্টার দেখছি কিন্তু বাস্তবে এরূপ সেন্টারের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ বলতেও পারছে না যে বারবিকান সেন্টার কোথায়। আমি প্রায় ২০ মিনিট পথ চলে লন্ডন ওয়াল নামক রাস্তায় এসে পড়েছি। সাথে করে বয়ে আনা ম্যাপে দেখলাম লন্ডন ওয়াল রাস্তার পাশেই 'বারবিকান সেন্টার'। নতুন উদ্যমে আবার চলতে শুরু করলাম।

লন্ডন ওয়াল সত্যিকার অর্থেই একটা মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যূহের দেয়াল। রোমানরা যখন লন্ডন দখল করে নিয়েছিল তখন লন্ডনের নাম ছিল লন্ডনিয়াম। এ দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে গেট ছিল। ২৫০০ বছর পুরনো সেই গেটগুলো কালের করাল থাবায়

www.pathagar.com

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তার স্মৃতি বাহক হিসেবে কিছু কিছু নিদর্শন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এ দেয়ালে স্থাপিত পশ্চিমে লাগগেট থেকে শুরু করে যথাক্রমে নিউগেট, আলডারস্‌গেট, ক্রিপল্‌গেট, বিসপস্‌গেট হয়ে পূর্বদিকে আল্ডগেট হয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে লন্ডন থেকে বের হয়ে যাওয়া যেত। আজ গেটের চিহ্ন পর্যন্ত নেই তবে গেটের নামে লোকালয় গড়ে উঠেছে। গেটের চিহ্নতো আজ পাওয়াই যায় না তবে প্রতিরক্ষা দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ বারবিকান এস্টেটে, লন্ডন মিউজিয়ামে এবং টাওয়ার হিলের আশপাশে দেখা যায়। যে রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি তা লন্ডন ওয়ালের পাশ দিয়ে বলেই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে লন্ডন ওয়াল রোড। লন্ডন মিউজিয়াম এ রাস্তার পাশেই।

লন্ডনিয়াম শহরটির আয়তন ছিল মাত্র ৩৩০ একর। লন্ডন ওয়ালটি ছিল প্রায় ১০ থেকে ১৫ ফিট উঁচু এবং ৬ থেকে ১০ ফিট প্রশস্ত। এ দেয়াল তৈরি করতে দীর্ঘদিন লেগেছিল । বারবিকান এস্টেটে এ দেয়ালের কিছু অংশ দেখেছি সযত্নে রক্ষিত আছে।

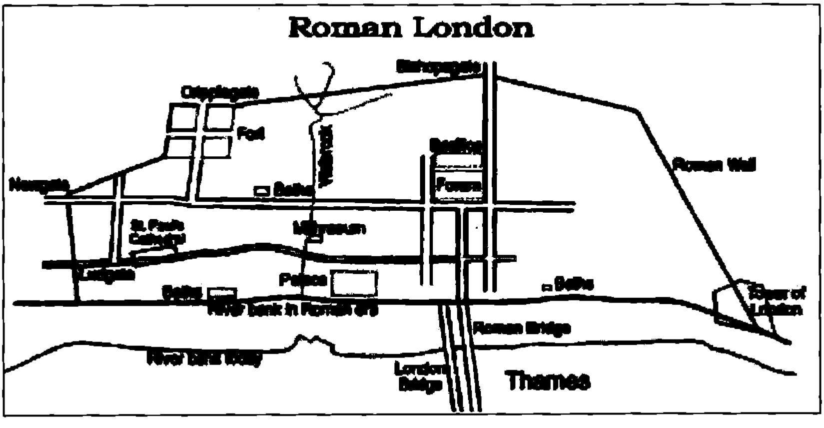

লন্ডন ওয়ালের একটি নকশা

৪৩ খ্রিস্টাব্দের আগে লন্ডন শহরের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেকালে টেমস নদীর ধারে পুরো অঞ্চলটিই ছিল লবণাক্ত জলাভূমি এবং মশা, মাছি ও পোকা-মাকড়ের আবাসভূমি। নদীটির কোনো কূল-কিনারা ছিল না বলে এর গতিপথও সুনির্দিষ্ট ছিল না। তবে বর্তমান লন্ডনের নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলে কিছুটা উঁচুভূমির

www.pathagar.com

সন্ধান পাওয়া যায় এবং ওখানেই রোমানরা প্রথম বসতি গড়ে তোলে এবং নাম দেয় লন্ডনিয়াম। সেই লন্ডনিয়ামই বর্তমানে লন্ডন নগরীতে রূপ পেয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই লন্ডনিয়াম একটা বন্দরের রূপ নিল এবং শুরু হলো ইতালি এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে তথা বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য। লন্ডনিয়ামের কাছে টেমস নদী বেশ গভীর ছিল বলে বড় বড় জাহাজ এখানে আসতে পারতো। রোমানরা তাই এখানে একটা নিরাপদ পোতাশ্রয় গড়ে তুলল। শুরু হলো জমজমাট ব্যবসা। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানের সাথেও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রচিত হলো এবং টেমস নদীর দক্ষিণ অঞ্চলেও জনসমাগম হতে থাকল এবং নদী পারাপারের প্রয়োজন হলো। তখনই স্থাপিত হলো লন্ডন ব্রিজ।

রোমানদের দখলদারিত্ব অনেক ইংল্যান্ডবাসীর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল এবং প্রায়ই ছোট খাট বিদ্রোহ হতে থাকল। লন্ডনের ওপর কয়েকবার সশস্ত্র আক্রমণও হলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে লন্ডনকে প্রতিরক্ষার জন্য মজবুত দুর্গ নির্মাণ করা হলো।

দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনকে শক্ত ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাচীর দিয়ে দুর্গ নির্মাণ করা হলো এবং লন্ডন ওয়ালটিকেও আরো মজবুত করা হলো। এ দুর্গটির স্থানেই বর্তমানে লন্ডন মিউজিয়াম অবস্থিত।

বারবিকানে ঘুরতে ঘুরতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল। এর কোনো আগা মাথা পাচ্ছিলাম না। এটা কি একটা বিনোদন পার্ক, একটা মিউজিয়াম না একটা আর্ট সেন্টার না অন্য কিছু-কিছুই ঠাওর করতে পাচ্ছিলাম না। গেট ১, ২ করে ৬টা গেট আছে যার মাধ্যমে বারবিকানে যাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার মাধ্যমে প্রবেশ করলাম কিন্তু কখনো দেখি লন্ডন মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের অফিস, কখনো দেখি কোনো অ্যাডভাইসরি সেন্টার আবার কোথাও দোকানপাট কিংবা বাড়িঘর। একদম দিশেহারা হয়ে গেলাম। এত সাধ করে বারিবিকান দেখতে এসে একদম নাজেহাল হওয়ার জোগাড়। কাউকে জিজ্ঞেস করেও কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না। অনেকেই বলে তুমি তো বারবিকানেই আছ, যা দেখছো সবই বারবিকানের অন্তর্ভুক্ত। আমার ধারণার সাথে এ বারবিকানের কোনো মিল নেই। ঘণ্টা দুই ঘোরাফেরা করে টের পেলাম যে একটা প্রাইভেট এস্টেট। এখানে আবাসিক দালান কোঠা রয়েছে। পার্ক রয়েছে। কিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং কিছু সরকারি এবং কিছু আধা সরকারি অফিসও এখানে দেখতে পেলাম। এখানে সময় নষ্ট করে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তাই বেরিয়ে এলাম এবং লন্ডন

www.pathagar.com

ওয়ালের পাশ দিয়ে স্লথগতিতে হেঁটে চললাম এবং কিছুটা পথ যেতেই চোখে পড়ল লন্ডন মিউজিয়াম।

১৯৭৪ সালে বারবিকান এস্টেটে অবস্থিত লন্ডন মিউজিয়াম এবং গিল্ডহল মিউজিয়ামকে একত্রিত করে এ মিউজিয়ামটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ৪ লাখ বছর পুরোনো দলিল দস্তাবেজ এ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ১৬৬৬ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যখন লন্ডন শহরের তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে যায় তার আগের এবং পরের দৃশ্যও এ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে এবং দেখা যায়। আমি বারবিকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা দিয়ে লন্ডন মিউজিয়ামে গেলাম। লন্ডন মিউজিয়ামটা দেখে যাওয়ার বাসনা নিবৃত্ত করতে পারলাম না। দেখেই যাব। কিন্তু টিকিট ঘর খুঁজতে যেয়ে শুনলাম যে, এখানে প্রবেশ করতে কোনো দক্ষিণা দিতে হয় না। তাই পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ন বদনে একটু সুখের পরশ পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সামনেই দেখতে পেলাম এক লম্বা প্রশস্ত করিডোর। পর্যটনসুলভ মনোভাব নিয়ে করিডোরের একধারে মেঝেতে বসেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং সাথে করে বয়ে আনা কিছু পানাহারের সদ্ব্যবহার করলাম। ঝিমিয়ে পড়া শরীরে একটু শক্তি এলো এবং বিষণ্ন মনে এলো একটু তৃপ্তি।

এবারে ধীরে সুস্থে আমি মিউজিয়ামে ঢুকলাম। ৪৩ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের আগমনের পর কিছুটা বাধা-বিপত্তি উত্তরণের পর লন্ডনের কাছেই কোলচেস্টারে তাদের একটি কেন্দ্র স্থাপন করল। বর্তমান লন্ডন শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও আরো মজবুত করে পূর্ণোদ্যমে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিল। এখানে একটি বন্দরও স্থাপন করলো এবং সমগ্র শহরটির নাম দিল লন্ডনিয়াম। টেমস নদীর এপারে যেমন শহর গড়ে উঠতে থাকলো তেমনি দক্ষিণ তীরেও শহরতলীর বিস্তার লাভ করলো এবং নদী পারাপারের জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তখনই কাষ্ঠ নির্মিত একটি সেতু নির্মিত হলো। সেটাই ছিল প্রথম সেতু এবং তারই নাম ছিল লন্ডন ব্রিজ।

রোমানরা এ দেশ থেকে শিকারি কুকুর, উল, ঝিনুক এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি আমদানি করতে থাকল এবং তা ছাড়া কৃতদাস হিসেবেও ইংরেজদের ব্যবহার করতে থাকল। রোমানরা যখন অনুভব করল যে তাদের গদি মজবুত হয়েছে তখন তারা ইংরেজদের জাগতিক উন্নয়নের জন্যে এবং উন্নত মানের সংস্কৃতি মনা করে গড়ে তোলার জন্যে তাদের আচার, আচরণ, ব্যবহার, নৃত্যগীত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপন ও চার্চ নির্মাণের দিকেও নজর দিল। উন্নতমানের

www.pathagar.com

কুটির শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রোম থেকে শিক্ষক নিয়ে এল। ইংল্যান্ডকে তারা কলোনি হিসেবেই ব্যবহার করতে শুরু করল এবং ১৫০ বছরের মধ্যেই লন্ডনের সাথে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের বিভিন্ন শহরের সাথে সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলল।

রোমানদের তৎকালীন কার্যকলাপ থেকে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে আজকের প্রগতিশীল যুক্তরাজ্যকে প্রগতির পথে হাতে খড়ি দিয়েছিল রোমানরা। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা নির্মাণ করে বিধর্মী ইংরেজদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করল। বর্তমানের সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল যা আমি দু দিন আগেই দেখে এসেছি এর গোড়াপত্তনও রোমানরাই করেছিল। এই স্থানে আগে বিধর্মীদের 'ডায়ানা মন্দির' বিদ্যমান ছিল। রোমানদের নানাবিধ কার্যকলাপের ফলে লন্ডন শহর বড় হতে থাকল এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল।

ইতালীয় সংস্কৃতির অনুকরণে লন্ডনিয়ামে স্নানাগার নির্মিত হলো। বিচার বিভাগ স্থাপিত হলো এবং একাধিক সুরম্য অ্যামপিথিয়েটার স্থাপন করা হলো এবং প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে সুশাসনের বন্দোবস্ত করা হলো। এত কিছু করার পরও রোমানদের বিরুদ্ধে অহরহই এখানে ওখানে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকল। সেই যুগের লন্ডন শহরকে সুরক্ষার জন্য ক্রমাগতই লন্ডন ওয়ালকে আরো মজবুত করা হতে থাকল। তৃতীয় শতকে বিদ্রোহ দমনের জন্যেই অধিকসংখ্যক রোমান সৈন্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং' তখনই লন্ডন ওয়ালের ভেতরে উত্তর পশ্চিম কোনেতে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ এবং বাসস্থানের জন্যে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হলো। তা ছাড়া লন্ডন ওয়ালের ভেতরেই আদি লন্ডন শহর গড়ে তোলা হলো।

www.pathagar.com

চৌদ্দ.

লন্ডন মিউজিয়াম

রোমানরা প্রায় ৪০০ বছর ধরে ইংল্যান্ড শাসন করে এবং লন্ডনিয়ামকে ইউরোপের একটি উন্নত নগরীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়। উন্নতমানের জীবন যাত্রার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তোলা হলো। লন্ডনের আধুনিকায়নের সাথে সাথে অন্যান্য রোমান অধিকৃত শহরেও তার বাতাস লাগল। লন্ডনিয়াম শহরটি বড় হতে থাকল এবং সাথে সাথে ইউরোপ থেকে ডেইনস্ (ডেনমার্কের অধিবাসী), জার্মান এবং স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশগুলো থেকে অধিক সংখ্যায় লোক অভিবাসনের জন্য লন্ডনে আসতে থাকল। এভাবেই লন্ডন শহরটি একটি আন্তর্জাতিক শহরের রূপ পেল।

বিদেশীরা এসে দেশ শাসন করবে এবং মজা লুটবে এটা স্থানীয় ইংল্যান্ডবাসীর কাছে অসহ্য মনে হতে থাকল এবং নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকল। এরূপ এক বিদ্রোহে কলচেস্টার দুর্গটি এবং কলচেস্টার শহরটি বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে খাক করে দিল। দুর্গের অভ্যন্তরে বসবাসরত প্রায় এক হাজার রোমান নাগরিক এতে মারা যায়। শহর ত্যাগ করে পালিয়ে যারা বাঁচার চেষ্টা করেছিল তাদেরও অনেককেই ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছিল। এই আগুনে কলচেস্টার শহরটিও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ল। সেকালে রোমানরা কলচেস্টারকেই রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করত এবং লন্ডননিয়াম ছিল মূলত সামদ্রিক বন্দর। রোমানদের ওপর এ ধরনের জুলুম হতে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে রোমানদের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে ৪১০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা দেশ ছেড়ে চলে গেল। এর ফলে বিরাট প্রশাসনিক শূন্যতা দেখা দিল এবং এ সুযোগে

www.pathagar.com

অ্যাংলো স্যাক্সনরা হানাদাররা দেশ শাসনের জন্যে এগিয়ে এলো। রোমানদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা নিরাপত্তার জন্য ওয়েলসের দিকে চলে গেল। এভাবেই কলচেস্টার এবং লন্ডন ঘিরে অ্যাংলো স্যাক্সনদের দ্বারা নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠল এবং শুরু হলো স্যাক্সন যুগ।

আমি মিউজিয়ামের স্যাক্সন ধরে এগিয়ে চললাম এবং আমার সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকল রোমান যুগ যা ৪১০ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়– সেই যুগের কথা চিত্রের ইতিহাস। রোমান যুগের পর দেশে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং অ্যাংলো স্যাক্সনরা হানাদার হিসেবে ধীরে ধীরে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে। রোমানদের চলে যাবার সময় থেকে শুরু করে স্যাক্সনদের আধিপত্য স্থাপন করা পর্যন্ত সময়কে ঐতিহাসিকগণ ইংল্যান্ডের অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সে যুগে যদিও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুঠাম ছিল না তবু লন্ডন বন্দরীর মাধ্যমে ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথে রমরমা ব্যবসা জমে উঠেছিল। এ সময়ই এই অঞ্চল থেকে কৃতদাস রফতানি পণ্য হিসেবে পাঠানো হতো। অ্যাংলো স্যাক্সনরা শাসন পদ্ধতি সুসমন্বিত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করতে থাকল। লন্ডন এবং তার আশপাশ এলাকা এসেক্সের অন্তর্ভুক্ত হলো। ৫৯৭ সালে রাজা এথেলবার্ট সেন্ট পল ক্যাথিড্রেলটি তৈরি করেন এবং তারপর থেকেই খ্রিস্টান ধর্ম একটা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ধীর গতিতে লন্ডন শহরটি পশ্চিম দিকে প্রসারিত হতে থাকে এবং এসব এলাকা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় ভাইকিংদের আক্রমণ এবং বছর ২০ এর মধ্যেই তারা লন্ডনে স্থায়ী অবস্থান গড়ে তোলে। ভাইকিংরা যদিও শক্তিশালী ছিল তবু তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে এবং ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা আলফ্রেড দ্য গ্রেট নিজেকে ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ভাইকিংদের প্রতি শান্তি আলোচনায় বসতে আহ্বান জানায়। সাময়িকভাবে ভাইকিংদের প্রাধান্য কমতে থাকে এবং ৯১১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে লন্ডন ইংল্যান্ডের স্যাক্সন রাজাদের শাসনে চলে আসে। রাজা অ্যাথেলরেডের সময় ভাইকিংরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা অ্যাথেলরেডের ভাইকিংদের ভয়ে পালিয়ে বিদেশে চলে যান। ডেনমার্কের রাজা কেনিউড ইংল্যান্ড শাসন করতে থাকেন। কিছুকাল পর নরওয়ের সাহায্য নিয়ে অ্যাথেলরেড কেনিউডকে লন্ডন ব্রিজের কাছে পরাজিত করে এবং ব্রিজটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। 'London Bridge is falling down' ছোটদের গানের ছড়ার গোড়ার ইতিহাস এখান

www.pathagar.com

থেকেই শুরু হয়। এই বইয়েরই তৃতীয় অধ্যায়ে এ ব্রিজটির ভাঙা গড়ার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। এথেলরেডের মৃত্যুর পর তার ছেলে এডমন্ড সিংহাসনে বসেন এবং লন্ডন ব্রিজটি পুনঃনির্মাণ করেন। কেনিউড সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং এডমন্ডকে পরাজিত করে আবারও ইংল্যান্ড দখল করে নেয় এবং ইংল্যান্ড শাসন করতে থাকে। ১০৮২ খ্রিস্টাব্দে কেনিউডের সৎ পুত্র এডওয়ার্ড দ্য কনফেসার ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং প্রখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে নির্মাণ কার্যে হাত দেন এবং ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণকাজ শেষ করেন। এর কিছুদিন পরই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তিনিই প্রথম রাজা যাকে এ অ্যাবেতে সমাহিত করা হয়। এর পরের রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেয়া হয়েছিল এ বইয়েরই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তাই পুনরাবৃত্তি না করে শুধু এটুকু বলে যাই যে এডওয়ার্ড দ্য কনফেসার ভগ্নিপতি হ্যারল্ডকে রাজ্যভার দিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত নরমান্ডি থেকে আগত উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার হ্যারল্ডের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়। এভাবেই স্যাক্সন যুগ শেষ হয় এবং শুরু হয় নরম্যান যুগ।

উইলিয়াম দ্য কঙ্কারার রাজ্য দখলের পরপরই অত্যন্ত কঠিন হাতে ইংরেজদের মধ্যে বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করার নীতি গ্রহণ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সকলকেই বশীভূত করে তিনি রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তিনি লন্ডন শহরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করলেন। স্যাক্সনদের ওপর থেকে অনেক বিধিনিষেধ উঠিয়ে নিলেন । লন্ডন শহরকে সুরক্ষিত করার জন্য 'Tower of London" নির্মাণ করলেন। রাজার উদার নীতির ফলে স্যাক্সনরা এবং নরমানরা সুন্দরভাবে সহাবস্থানের সুযোগ পেল এবং ইংল্যান্ড দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে থাকল।

নরমান যুগের পর আসে টিউডর যুগ এবং স্কটল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস প্রথম জেমস নাম ধারণ করে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৬৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তথ্য কিছু জানতে পার-লাম। একটি রুটির দোকান থেকে অগ্নিকাণ্ডের শুরু এবং তা বিস্তৃতি লাভ করতে করতে প্রায় পুরো লন্ডন শহরকেই গ্রাস করে ফেলে। চারদিন ধরে এ আগুন প্রজ্বলিত থাকে এবং শহরের ৮০% বাড়িঘর, দোকান পাট, অফিস আদালত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এ অগ্নিতে ১৩ হাজার ২০০ বসতবাড়ি, ৮৭টি গির্জা এবং দেয়াল ঘেরা শহরের প্রায় সব অফিস ভবন ভস্মীভূত হয়।

www.pathagar.com

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডের ফলে লন্ডনের পুরনো বাড়িঘর, প্রাসাদ অট্টালিকা, দোকানপাট ভস্মীভূত হয় এবং লন্ডনবাসীরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে লন্ডন শহরকে নতুনভাবে আধুনিকতার রূপ দিয়ে তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। নতুন ডিজাইনে লন্ডনকে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিলেন তৎকালীন আর্কিটেক্ট স্যার ক্রিস্টোফার রেন এবং জন এভলিন। তৎকালীন প্রধান সড়কসমূহ সস্থানে রেখে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে সরকার "Rebuilding Act" অর্থাৎ নগর পুনঃনির্মাণ আইন প্রণয়ন করল যাতে সেখানে সম্ভব পুরনো রাস্তাকে প্রশস্তকরণের বিধান থাকল এবং বাসভবনগুলোকেও স্বল্পপরিসরে আধুনিকতার আঙ্গিকে নির্মাণ করার বিধান থাকল। চার্চগুলোকে আধুনিকীকরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকল। সেন্ট পল ক্যাথিড্রালটিও স্যার ক্রিস্টোফার রেনই পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। শহরটির বাজার এলাকা, অফিস ও ব্যাংকপাড়া এবং আবাসিক এলাকার পুনর্বিন্যাস করা হলো এবং লন্ডন শহর বিশ্বের অন্যতম সুন্দর নগরীতে পরিণত হলো। এ ছাড়াও রাস্তার যানবাহনও নতুনরূপ পেল এবং টেমস নদী পারাপারের জন্য প্রয়োজন হলো অনেক সেতুর।

এ ছাড়াও লন্ডনকে আরো আধুনিক করা হলো ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগ বাড়িয়ে। বাক-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হলো। তারপরও রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে এক দাঙ্গায় প্রায় ৫০০ লোক হতাহত হলো এবং দাঙ্গা দমনের জন্য সশস্ত্র বাহনীকে নামাতে হয়েছিল।

শপ্তদশ শতাব্দী ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন আনে। ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এসব পরিবর্তনের মূল কারণগুলো ছিল–

১. শহরগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় রুজিরোজগারের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার প্রবণতা বেড়ে যায়। অধিকসংখ্যক লোক শহরে আসার কারণে বিভিন্নমুখী মতবাদের সৃষ্টি হলো শহরে। এতে সামাজিক চিত্র, সম্পদ বণ্টনের চিত্র, ন্যায়-অন্যায়ের চিত্র অতি সহজেই পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এতে সামাজিক অসন্তোষ বেড়ে যায় এবং শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে।

২. রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে মতভেদ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং এর কারণে দেশে অশান্তি বিরাট আকার ধারণ করে। এ সময়েই স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে মধ্যেও যুদ্ধ বাধে।

www.pathagar.com

গৃহযুদ্ধের কারণগুলোর উল্লেখ করতে যেয়ে ইতিহাসবেত্তারা বলেন, অন্যতম কারণ ছিল রাজা চার্লসের অবিমৃষ্যকারিতা। কেন এই যুদ্ধ হলো- চার্লস মনে করতেন যে পার্লামেন্ট হচ্ছে রাজার আজ্ঞাবাহী সুতরাং রাজা যা বলবে পার্লামেন্ট সেই অনুযায়ী চলবে। এ নিয়েই বিরোধ এবং এ বিরোধে ক্রমওয়েল নামক এক ব্যক্তি রাজা প্রথম চার্লসের দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করেন এবং রাজাকে গদিচ্যুত করার জন্যে এবং রাজতন্ত্র উৎখাতের জন্যে এক অভ্যুত্থান গড়ে তোলেন এবং পার্লামেন্টকে সমর্থন যোগালেন। বিরোধ এ পর্যায়ে পৌঁছল যে রাজা পার্লামেন্ট ডাকা বন্ধ করে দিলেন এবং পার্লামেন্ট ছাড়াই রাজকার্য পরিচালনার প্রচেষ্টা চালালেন। পার্লামেন্টও এর ক্ষমতার আওতাধীন ট্রেজারির সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন। রাজ্য চালাতে অর্থের প্রয়োজন হয় এবং রাজা অর্থ সংগ্রহের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করতে থাকলেন যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে সম্পদশালীদের রাজার কোর্টে ডেকে এনে জোর করেই টাকা আদায় করার ব্যবস্থা। এতে পুরো দেশেই অসন্তোষ দেখা দিল। সামাজিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক ডামাডোল এবং বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে দেশে অরাজকতা দেখা দেয় এবং দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যায় এবং অলিভার বাহিনী রাজাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন এবং ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত রাজাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অলিভার ক্রমওয়েল ক্ষমতা দখল করেন এবং লর্ড উপাধি ধারণ করেন। তৎপর তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের লর্ড প্রেসিডেন্টের পদে নিজেকে উন্নীত করেন এবং দাপটের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এ পদ্ধতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী শাসক বলে চিহ্নিত হন।

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্রমওয়েল মৃত্যুবরণ করেন এবং তার বিভিন্ন অপসংস্কারমূলক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে দেশবাসী পুনরায় রাজতন্ত্র বহাল করে এবং প্রথম চার্লসের ভাই দ্বিতীয় চার্লস রাজা হন।

লন্ডন মিউজিয়াম দেখে ইংল্যান্ডের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য পেলাম যা এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি। আরো অনেক বিস্তারিত লেখা যেত কিন্তু সুধী পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে এ আশঙ্কা মনে জেগেছে বলেই সারাংশ দিয়েই শেষ করেছি।

লন্ডন বিশ্বের অন্যতম বড় এবং প্রাচীন শহর। দেখার ও জানার অনেক কিছুই আছে। একদিনে যতটুকু পদচারণা করা যায় ততটুকু করেছি তাই আজকের মতো এখানেই যাত্রা শেষ করে ঘরে ফিরলাম।

www.pathagar.com

পনের.

টেইট গ্যালারি মডার্ন

দু দিন আগেই বীথির বান্ধবী জেনি পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখা নিয়ে আমার সাথে আলাপ করছিল। আমাকে বলেছিল যে অত কষ্ট করে লন্ডন না দেখে গাড়িতে করে গেলেই তো হয়। আমি তাকে বলেছিলাম যে লন্ডনের সাথে আমি ১৯৫০ সাল থেকেই পরিচিত এবং গাড়িতে করেও প্রচুর জায়গা ঘুরে দেখেছি এবং লন্ডন সম্বন্ধে কিছু ধারণা পেয়েছি। কিন্তু কোনো স্থানকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হলে পায়ে হেঁটে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখার বিকল্প কিছু নেই। পায় হেঁটে কোনো কিছু দেখতে গেলে কাছে থেকে দেখা যায়। নতুন কিছুর সাক্ষাৎ পেলে সেখানেই থেমে যাওয়া যায় এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায় তার প্রকৃতি, তার রূপ, তার স্বাদ, তার গন্ধ। ওই বস্তু কিংবা স্থানটির ইতিহাস জানতে হলে তথ্য উদ্ধার করার জন্যে সুযোগ খুঁজে নেয়া যায়। তুলনামূলক চিত্র আঁকা যায়। গাড়িতে গেলে এসব কিছুই সম্ভব হয় না। তাই আমি পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখছি এবং বলতে দ্বিধা নেই যে পথ চলতে চলতেই আমি লন্ডনের ইতিহাস, লন্ডনের ভূগোল, লন্ডনের অতীত, লন্ডনের ক্রমবিবর্তনের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিত্র তথা লন্ডনের প্রাণকে খুঁজে পাই। তাই হেঁটে চলতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে কিন্তু মানসিক তৃপ্তি তা শুধু পুষিয়ে দেয় না বরং অনেক গুণ আনন্দ বৃদ্ধি করে দেয়। আমার জোরাল বক্তব্য শুনে জেনি বলল যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একদিন আমার সাথে পায়ে হেঁটে লন্ডন ভ্রমণে যেতে চায়। আমি তৎক্ষণাৎ তার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলাম এবং সেই অনুযায়ী আজ বুধবার ২৩ জুলাই ২০০৩ সালে পথে নামলাম।

প্রথমেই প্রথামতো ঘর থেকে বেরিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করে আমাদের পদযাত্রা শুরু করার স্থানে পৌঁছতে হয়। আজকে আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে ওয়াটারলু টিউব স্টেশন থেকে। এ প্রোগ্রাম আমি আগে থেকে নিজেই স্থির করে

www.pathagar.com

নেই। আজ আমরা টেইট গ্যালারি-মড ার্ন দেখতে যাব। প্রোগ্রাম অনুযায়ী উডফোর্ড টিউব স্টেশন থেকে রওনা হয়ে প্রায় ১৩টি স্টেশন পার হয়ে আমরা টটেনহাম কোর্ট রোড টেউব স্টেশনে পৌঁছলাম এবং সেখান থেকে নর্দার্ন লাইনের টিউবে করে দক্ষিণমুখী যাওয়ার ট্রেনে করে তিনটি স্টেশন পার হয়ে চতুর্থ স্টেশন ওয়াটারলুতে নেমে যাব। প্রায় সব পথটাই হবে ভূনিম্ন দিয়ে। এমনকি টেমস নদীটিও পার হব নদীর তল থেকে আরো ৫০ ফিট নিচ দিয়ে। এ টেমস নদীর সুরঙ্গ পথই এককালে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি ছিল। এ ৫০ মাইল পথ যদি আমরা ভূপৃষ্ঠ দিয়ে অতিক্রম করতে যেতাম তাহলে লন্ডনের ট্রাফিকের যানজটে লাগত প্রায় ঘণ্টা চারেক আর আমরা ভূনিম্ন পথে যেতে পারছি মাত্র এক ঘণ্টারও কম সময়ে। ঠিক এ কারণেই বিশ্বের জনবহুল শহরগুলোতে পাতাল রেলের প্রবর্তন করেছে। ঢাকা যে গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আমরা যদি পাতাল রেলের প্রবর্তন না করি তাহলে শহরটি যানজটের কারণেই অচল হয়ে পড়বে।

ট্রেন যাত্রা পথে জেনি আমাকে বলল 'খালু আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে আমরা খুবই আনন্দ পাই এবং অনেক কিছু জানতে পারি। আপনি ইউরোপের প্রায় সব দেশেই গিয়েছেন, আপনি সব ভ্রমণের কাহিনীই লিখে ফেলুন না কেন? তা ছাড়া আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী, আপনার চোখে দেখা বিগত ৬০-৭০ বছরের সামাজিক জীবনের চিত্র, রাজনৈতিক ধারার পট পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত অবশ্যই সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে, আমাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান হবে তাই সেগুলোও লিখে ফেলা উচিত নয় কি?'

আবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম এবং নির্দ্বিধায় স্বীকার করব যে খুব তৃপ্তিও পাচ্ছিলাম। কিন্তু কিভাবে উত্তর দেব তা নিয়ে সংশয়ে ভুগছিলাম। জেনিই যেন আমার উদ্ধারে এগিয়ে এল এবং বলল ছোট বেলার কাহিনী লিখে ফেলেন। ছাত্রজীবন, নাবিক জীবন, চাকরিরত জীবনের অভিজ্ঞতা, অবসর জীবনের কাহিনী ইত্যাদি কত কিছুই তো লিখতে পারেন? অবশ্যই অনেক কিছু লিখা যায় যদি দৃঢ়তার সাথে কলম ধরে রাখা যায়। বিখ্যাত কবি আল মাহমুদ বলতেন, আপনার জীবনটাই একটা উপন্যাস শুধু প্রয়োজন ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা তাহলেই পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য হয়ে উঠবে। তিনি অবশ্যই বলতে ভোলেননি এতেও সাধনার প্রয়োজন হবে এবং ইচ্ছে করলেই আপনি ধীরে ধীরে লিখে ফেলতে পারেন। সুখপাঠ্য হিসেবে আমার জীবনবৃত্তান্ত সর্বজনগৃহীত হবে বলেই তার বিশ্বাস। উপদেশ হিসেবে বললেন যে, সর্বদা হাতের কাছে কাগজ ও কলম রাখবেন এবং তখনই দেখবেন হারিয়ে যাওয়া মনের পাখিরা ধরা দিচ্ছে। শ্রদ্ধেয়

www.pathagar.com

কবির উপদেশ কিছু কিছু পালন করেছি ফলও পেয়েছি এবং আমার ডজনখানেক বই প্রকাশিতও হয়েছে। সম্প্রতি আমার লেখার ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তবু আগের ধারাবাহিকতায় এখনো কিছু কিছু লিখে চলছি। তাই ধীরে হলেও বছরে দু-একখানা বই ছাপাতে পারি। আজ জেনির কথাতে একই সুর, একই আবেদন, একই তাগাদা। চলতে চলতেই ভাবলাম অযৌক্তিক কথা কিছুই বলেনি এবং আমার একটা জবাব সে প্রত্যাশা করে। তাই বললাম কিছুক্ষণ পর ট্রেন ভ্রমণের শেষে নদীর তীরে বসে বসেই তোমার প্রশ্নের জবাব দেব । জেনি এতেও সন্তুষ্ট নয়– সে চায় আমি এখন থেকেই জবাব দিতে শুরু করি। ততক্ষণে আমাদের ট্রেন ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ওয়াটারলু স্টেশন থেকে টেইমস নদীর তীর পর্যন্ত আসতে পথে পড়ল কিংস কলেজ লন্ডন । টেমস নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে আমরা সুপ্রশস্ত পেভমেন্ট ধরে পূর্বদিকে ব্লাকফ্রায়ার্স পুলের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় আধা মাইল পথ চলার পর আমরা টেইট গ্যালারি ও টেইট মডার্নের সামনে উপস্থিত হলাম। নদীতে তখন ভাটা চলছিল তাই মনে হচ্ছিল সব নৌযান অনেক নিচে অবস্থান করছে। এখানেই বলে রাখি যে টেমস নদীর জোয়ারভাটায় পানির উচ্চতা ২৬ ফিট বাড়ে-কমে।

বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই নদীর ধারেই শ্রান্ত পথিকের জন্য স্থাপিত বেঞ্চে বসে গেলাম। সুযোগ পেয়ে এবারে জেনী তার টুকিটাকি খাবার পোঁটলা খুলল। অত্যন্ত তৃপ্তি ভরে আমরা পানাহার করতে থাকলাম এবং জেনি তার গল্প শোনার জন্য তাগিদ দিতে থাকল। অগত্যা আমাকে বিক্ষিপ্তভাবে আমার ফেলে আসা দিনগুলোর কিসসা ও কাহিনী বলা শুরু করতে হলো। বললাম যে ব্রিটিশ আমলে ১৯২৬ সালে পূর্ববাংলায় আমার জন্ম। গ্রামে এবং ক্ষুদ্র মফস্বল শহরেই জীবনের প্রথম ১৫টি বছর কাটিয়েছি এবং ১৯৪২ সনে ম্যাট্রিক পাস করার পরই প্রথম ঢাকায় আসি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নের জন্য। ১৯৪৪ সালে আমি সায়েন্সে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কলকাতায় চলে যাই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার জন্য। সেকালে ব্রিটিশ আমলে গ্রাম ও ইউনিয়নভিত্তিক সমাজব্যবস্থারই প্রচলন ছিল। ধীর লয়ে জীবন প্রবাহিত হতো। বর্তমান যুগের মতো এত চটক ছিল না। আমার লিখা 'পুরনো সেই দিনের কথা' বইটিতে সংক্ষিপ্তভাবে আমি সেই যুগের অর্থাৎ আমার ছেলেবেলার কাহিনী কিছুটা তুলে ধরেছি। ১৯৪৪ সালের পরই যেন ধরণী উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) বিশ্বব্যাপী নব জাগরণের সৃষ্টি করল। পরিবর্তনের উথাল-পাথাল দিনগুলো নির্জীব অবস্থায় বহমান আমাদের দেশের তৎকালীন সমাজব্যবস্থায়,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এল। পরাধীন দেশ ভারত, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য প্রথমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন পরে রীতিমতো বিদ্রোহের দাবানলে রূপান্তরিত হলো। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ছিল আমার ছাত্রজীবন। এর মাঝেই দেশ স্বাধীন করার ব্যাপারে আমাদের ছাত্রসমাজের সংগ্রাম অব্যাহত থাকল এবং দেশ বিভাজনের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি তথা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু বিভক্তির অনল আমাদের সব উপমহাদেশেই ছড়িয়ে পড়ল এবং আমাদের সবাইকেই নিদারুণ খেসারত দিতে হয়েছিল। ভয়াবহ পরিস্থিতির কিছু আভাস আমি আমার লেখার এখানে ওখানে দিয়েছি বটে কিন্তু কোনো গ্রন্থাকারে তা লিপিবদ্ধ করিনি। হয়তোবা ১৯২৬ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সময়টাকে অবলম্বন করে 'ঘূর্ণিঝড়' নামে একখানা গ্রন্থ লিখা যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড় নামটা মনে এ জন্য এলো যে, সেই যুগেই আমাদের সনাতন সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উলট-পালট ওই ঘূর্ণিঝড়ের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হলো এবং চালচুলো তছনছ হয়ে পড়ল। তদুপরি আমাদের গৃহবিবাদ এবং হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়লাম। আমরা ঘর গেছাতে এবং আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতির খতিয়ান নিতে গিয়ে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কিভাবে আমরা বেঁচে থাকব? চারদিকেই অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিলাম। সব জাতিই যেন একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

সেই দিশেহারা অবস্থা থেকে আমরা উত্তরণের পথ খুঁজে বের করলাম এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চললাম। উপমহাদেশের বিভক্তি এবং ঘর গোছানোর প্রচেষ্টায় যে সময়টা আমরা উত্তরণ করেছি সেই বছরগুলোকে নিয়ে 'দিশেহারা' নামক একটি গ্রন্থ লিখা যেতে পারে।

এই ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমার ছাত্রজীবন শেষ হলো এবং নতুন উদ্ভূত দেশ পাকিস্তানের বাসিন্দা হিসেবে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলাম। দুর্ভাগ্য এমনই যে, ভূমিপুত্র হয়েও অর্থাৎ দেশের ছেলে হয়েও নিজ দেশে পরবাসী হয়ে গেলাম। বাস্তবেও তাই হলো। সদ্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিপাপ্ত হয়েও দীর্ঘ এক বছরকাল ক্যাজুয়াল লেবারার অর্থাৎ দিনমজুর হিসেবে সোনাকান্দা ডকইয়ার্ডে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কিদওয়াই, ফোরম্যান সেন্ডেল এবং ওয়ার্ক সুপারভাইজার মুন্সীদের অধীনে গোলামি করতে হলো দৈনিক ১ টাকা ১২ আনার মজুরিতে। ভাগ্যের পরিহাস– যে দেশ গঠনের জন্য 'লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্তান' মনোবৃত্তি নিয়ে

www.pathagar.com

জীবনবাজি রেখে আন্দোলন করেছি এবং দেশ গঠন করে ছেড়েছি সে দেশ আমাদের রাত শেষে বারবণিতাদের মর্যাদা দিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্যে ঘরে স্থান দিল না, বাইরে ঠেলে দিল। দেশ দখল করে নিল বহিরাগত মোহাজের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জাঁদরেল পাঞ্জাবিরা। এ দেশে থাকা আর চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে এল তাই অজানার পথে পাড়ি জমালাম। নিজ দেশ ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে এলাম। 'অজানার পথে' একটি গ্রন্থ হতে পারে যার সময়কাল হবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ।

জেনির সাথে বসে স্বপ্নই দেখছি বোধহয় এবং কথার ফুলঝুড়িতে যে সময় কেটে যাচ্ছে সেদিকে আর খেয়াল নেই। জেনিও বোধহয় এতক্ষণে উপলব্ধি করেছে যে এ গল্প শেষ করা দরকার তাই সে জিজ্ঞেস করল 'খালু নেভিতে কখন যোগ দিলেন। আমি বললাম যে অজানার পথে চলতে চলতেই একসময় সাগরের ডাক শুনতে পেলাম এবং ভাটার টানে সাগরে গিয়ে পড়লাম। জেনি এবার বলল, ব্যস এবার সাগরের ডাক নামে একটি বই লিখে ফেলেন। প্রস্তাবটি মন্দ নয়। 'সাগরের ডাক' বইতে থাকবে আমার নাবিক জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস যা শুরু হবে ১৯৫০ থেকে এবং শেষ হবে ১৯৭২ সালে। নাবিক জীবনের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান, বন্দর থেকে বন্দরে ভ্রমণের কিসসা কাহিনী, বিভিন্ন দেশের বন্দর জীবনের কথাসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রলেপ দিয়ে শেষ হবে 'সাগরের ডাক'।

আর নয়। এবার আমরা উঠলাম এবং ধীরগতিতে টেইট গ্যালারির দিকে অগ্রসর হলাম। আমরা 'Tender and Cruel' প্রদর্শনীটি দেখতে গেলাম পশ্চিম দিকের 'Turbine Hall'-এর প্রবেশ পথ দিয়ে। টারবাইন হল নামটা হলো কেন? গত মহাযুদ্ধে এখানে একটা গ্যাস স্টেশন ছিল এবং এ অঞ্চলে স্থাপিত ছিল গ্যাস টারবাইনটি। সেই থেকে এটার নাম হয়েছে টারবাইন হল। বর্তমানে এটা টেইট মডার্ন গ্যালারির প্রবেশপথ ও টিকিট ঘর।

টেইট গ্যালারি একটা মিউজিয়াম এবং বিশিষ্ট মহলে এর যশ শুনেছি প্রচুর কিন্তু উপলব্ধি করতে পারিনি কেন টেইট গ্যালারি নিয়ে এত হইচই। সাধারণ লোক টেমস নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এই টেইট গ্যালারির খোঁজও যে রাখে না তার বিবরণ আমি এ পুস্তকেরই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিয়েছি। আমি লন্ডন দেখতে বেরিয়েছি তাই আমার পক্ষে এ টেইট গ্যালারি না দেখে যাওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তাই আমাকে দেখতেই হবে। বিরাট একটা হ্যাঙ্গার ধরনের অবকাঠামোতে ঢুকলাম। নিচের তলায় টিকিট ঘর এবং ইংরেজরা বেনেদের জাতি বলে যেখানে বিনা পয়সায়ও লোক ঢুকতে চাইবে না সেখানে চাকচিক্যের একটু প্রলেপ দিয়ে এবং টিকিটের হার আরো একটু বেশি করে রেখে

www.pathagar.com

রবাহুতদের আকর্ষণ বাড়ায় এবং আমাদের মতো বিদেশীদের পকেট থেকে মাল খসিয়ে নেয়। টিকিট ঘর থেকেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল। এটা একটা পেইন্টিং প্রদর্শনী এবং এখানে রয়েছে 'Cruel and Tender' নামক একটি গ্যালারি যেখানে প্রায় অর্ধশতাধিক কক্ষে বিগত ১০০ বছরের বিখ্যাত ফটোগ্রাফি সংরক্ষিত আছে। এ ছবিগুলো দুটো বিশিষ্ট ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। একটি ধারা জার্মান থেকে এবং অন্যটি আমেরিকা থেকে উৎসারিত।

ভাবমূলক বিমূর্ত শিল্পকলা কিছুই উপলব্ধি করতে পারলাম না । আমি বিনা দ্বিধায়ই বলব যে, হয় আমি আর্ট সম্বন্ধে মোটেই কিছু জানি না তাই এ সৃষ্টির মর্ম উপলব্ধি করতে পারলাম না এবং উপভোগও করতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হলো হাবিজাবি কিছু রঙের প্রলেপ এবং কিছু রেখাঙ্কন। তবু লোক দেখতে যায় এবং এসব চিত্রকলা দেখে ধন্য হয়ে যায় এবং মনে করে যে, জীবন সার্থক হলো। একি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য না আর কিছু? এও যেন মন মাতানো রূপের ঝলক। যার চোখে যে রূপ ধাঁধার সৃষ্টি করে সেই মোহাবিষ্ট হয়। আমরা প্রায় সকলেই রূপের প্রশংসা শুনে রূপ দেখি। শ্রবণের মাধ্যমে রূপের সৌন্দর্য দেখি বলে কুরূপকেও অপরূপ মনে হয়। আমার মনে হতে থাকল যে, এ মিউজিয়ামটি দেখতে এসে কিছু অর্থের অপচয় করে গেলাম। যাই হোক এসেই যখন পড়েছি তখন মিউজিয়ামটা দেখেই যাই।

তিনটি তলায় বিভক্ত এ মিউজিয়ামটির প্রথম তলায় টিকিট ঘর এবং দর্শকদের সুবিধার্থে রেস্তোরাঁ, বসার স্থান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য ক্রিয়া-কলাপ সমাধানের জন্য ব্যবস্থাদি করে রাখা হয়েছে । দর্শকদের আরাম ও স্বস্তি প্রদানের জন্য এখানে যাবতীয় ব্যবস্থাদিই রয়েছে। দ্বিতীয় লেভেল অর্থাৎ তলটাই সর্বপ্রধান এবং এখানে সর্বমোট ৪৩টি কক্ষ ও হলরুমে রয়েছে অসংখ্য প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্পকলাসমৃদ্ধ প্রদর্শনীয়গুলো নানাভাবে এবং উপায়ে দেখে কয়েকদিন কাটিয়ে দেয়া যাবে তবু রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। Abstruct Painting এবং Ges sculpture-এর বৈশিষ্ট্যই এখানে। শিল্পী কী বুঝাতে চান তা হৃদয়ঙ্গম করে কোনো একটা একক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অন্য দুই বা ততোধিক সমালোচকের পক্ষে সম্ভব নয়। ওই শিল্পকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং কারো ব্যাখ্যাকে অমূলক কিংবা অর্থহীন ভেবে বীতশ্রদ্ধভাবে ফেলে দেয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে বলেই এই বিভ্রম। বিভ্রমের খোরাক শিল্পতেই নিহিত আছে। কেউ এ ধরনের শিল্পকলার মধ্যে নিজ কল্পনার শক্তি দিয়ে অনেক কিছুই দেখতে পায়

www.pathagar.com

আবার কেউ হয়তো অত্যধিক বাস্তববাদী বলে সুস্পষ্ট কিছুই অবলোকন করে না। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ছবি দেখতে যেয়ে 'যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি- ছবি দেখে কম' হতে পারে আমরা অধিকাংশ লোকই বিমূর্ত ছবির রঙ ও কালির বর্ণ, তুলির আঁচড় এবং রেখাচিত্র বেশি দেখে থাকি বলে ছবি কম দেখি এবং ছবির ভাবার্থ আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

এই টেইট গ্যালারিতে শুধু ব্রিটিশ নয়- আমেরিকা, জার্মানি এবং বিশ্বের বহু দেশের নামকরা শিল্পীদের ছবিও স্থান পেয়েছে। শিল্পীরা কারা, তাদের নামধামও একটু দেয়া দরকার নইলে লিখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই সেদিকে একটু দৃকপাত করি। জার্মান আর্টিস্ট উলফ্‌গ্যাং টিলম্যান, ব্রিটেনের ব্রিজিট রাইল, জোসেফ মালর্ড, উইলিয়ম টার্নার, হেনরি মুর, উইলিয়াম হাগার্থ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান লাইব্রেরির মতো এদেরও শিক্ষা বিস্তারের জন্য কার্যক্রম রয়েছে। ফিল্ম, ভিডিও এবং ক্যাসেটসহ অন্যান্য শিক্ষা বিস্তারে উপযোগী উপকরণগুলো মেম্বারদের সরবরাহ করা হয়ে থাকে। টার্নার পুরস্কারপ্রাপ্ত টিলম্যান স্থির ফটোগ্রাফ এখন বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। আকৃতি এবং জ্যামিতিক জগতের সরল এবং বক্র রেখা দ্বারা যে অনন্য সুন্দর ছবি তৈরি করা যায় এবং যার ভাব প্রকাশ ক্ষমতাও নন্দনীয় তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্রিজিট রাইলের রেখাচিত্রে।

টেইট গ্যালারিতে প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটানোর পর ঘরে ফেরার পথে পায়ে হেঁটে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স সেতুটি পার হলাম। এ সেতুটির নির্মাণ কাজ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৯৯৫ ফিট দীর্ঘ উভয় পাশে ৭ ফিট প্রশস্ত ফুটপাথসহ সর্বমোট ৪২ ফিট প্রশস্ত সেতুটি জনসাধারণের পারাপারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ৯টি খিলান সম্পন্ন এ সেতুটি টেমস নদীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। সেতুটি প্রাইভেট উদ্যোগে উইলিয়াম পিট (এলডার) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে পিট সেতু হিসেবেই এটি পরিচিত ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে পারাপারের জন্য জনপ্রতি আধা পেনি করে টোল দিতে হতো। পরে সরকার এ ব্রিজটি কিনে নেয় এবং টোল উঠিয়ে দেয়। পরে টেমস নদীর উত্তর পাড়ে ব্লাকফ্রায়ার্স আশ্রমের নাম অনুসারে এ সেতুটি ব্লাকফ্রায়ার্স সেতু নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সেতুটির পূর্ব পাশে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স রেলওয়ে সেতুটি অবস্থিত। ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে এ সেতুটির আরো সংস্কার ও উন্নতিসাধন করা হয়।

দিনের শেষে পরিশ্রান্ত দুই পদযাত্রী পাতাল রেল ধরে ঘরে ফিরলাম। বিকেল তখন ৬টা।

www.pathagar.com

ষোল.

লন্ডনের হিন্দু মন্দির

লন্ডন একটা কস্মোপলিটান নগরী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে এখানে কমনওয়েলথভুক্ত প্রায় সব দেশেরই নাগরিকের অবাধে আসার এবং চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ ছিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য ব্রিটিশ প্রজা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে লন্ডনে বসবাস শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রজাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছে। তাই এখানে মন্দির, মসজিদ, সিনাগগ এবং বিভিন্ন ধরনের উপাসনালয় গড়ে উঠেছে।

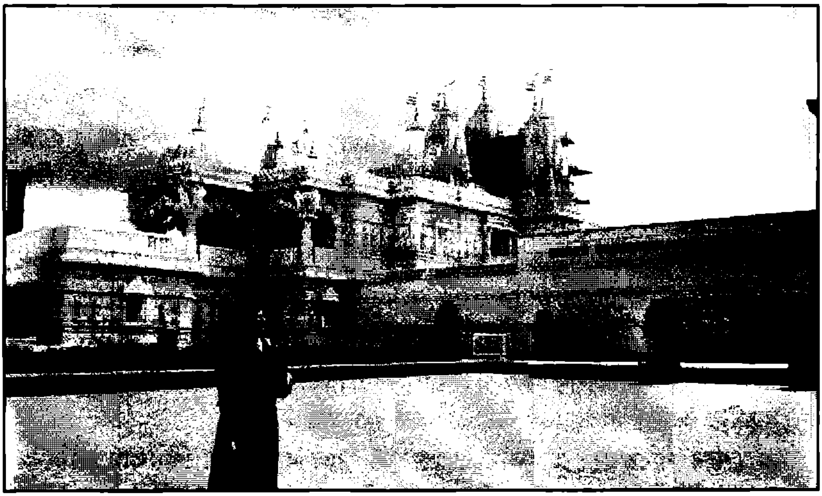

নিসডেনের হিন্দু মন্দির। লেখকের সফরসঙ্গী জেনিকে দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

সে রকমই একটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নিসডেনের ১০৫-১১৯ ব্রেন্টফিল্ড রোডে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরটি। আজ বৃহস্পতিবার ২৪ জুলাই ২০০৩ সালে আমি এবং জেনী মন্দিরটি দেখতে গেলাম। ভূনিম্ন জুবিলি লাইন ধরে অক্সফোর্ড স্ট্রিট এবং সেখান থেকে পুনরায় পাতাল রেলে করে ওয়েমব্লি স্টেশনের আগের স্টেশন নিসডেনে নামলাম। নিসডেন স্টেশন থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রী স্বামী নারায়ণ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। নিসডেন স্টেশন থেকে মন্দিরটি চিনে আসা খুবই কষ্টকর মনে হচ্ছিল। তবে জিজ্ঞেস করে এখানে আসাতে একটা অভিজ্ঞতা হলো। এ অঞ্চলে শ্রীলঙ্কা থেকে অনেক মুসলমান এসে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তাদেরই নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলতে চলতে এক সময় দেখলাম দূরে মন্দিরের গম্বুজের চূড়া। দু শ গজ দূরে থেকেই মন্দিরের ৭টা গম্বুজই নজরে এল। দেখলাম তিনটি গম্বুজ সনাতন হিন্দু মন্দিরের ধাঁচে নির্মিত এবং ৪টি অবিকল মসজিদের স্টাইলে নির্মিত হয়েছে।

মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য কোনো প্রকার প্রবেশ ফি দিতে হয় না তবে মন্দিরে প্রবেশের জন্য মূল গেট থেকে অনুমতি নিতে হয় এবং এ প্রক্রিয়াটি সমাধান করতে বেশ সময় লেগে যায়। অনুমতি নেয়ার জন্য জেনি এগিয়ে গেল এবং আমি মন্দিরের বারান্দায় একটি কোণে আমার পায়ের যত্নে নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম। পায়ে চিরাচরিত ব্যথা তো আছেই তারপর আজ উঁচু-নিচু পথে অনেকটা পথ হাঁটাতে বেশ ব্যথা অনুভব করছিলাম তাই জুতো খুলে পায়ের পরিচর্যা করাটা একান্তভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

জেনি প্রায় ১ ঘণ্টা পর এল। এতটা সময় লাগল? এর উত্তরে জেনি বলল যে ওরা যাচাই-বাছাই করেই মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। তবে সময়টা একটু বেশি লেগে গেছে এ জন্য যে কাউন্টারের ক্লার্ক মধ্যাহ্ন বিরতিতে ছিল। যাই হোক আমরা হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করলাম। গিনেস ওয়ার্ল্ড বুকের তথ্য অনুযায়ী ভারতের বাইরে এই শ্রী স্বামী নারায়ণ মন্দিরটি বিশ্বে সর্ববৃহৎ মন্দির। এ মন্দিরটি তৈরি করতে বুলগেরিয়া থেকে আনীত ২ হাজার ৮০০ টন লাইমস্টোন এবং ইতালি থেকে আনীত ২ হাজার টন কারারা মার্বেল পাথর প্রথমে ভারতে আমদানি করা হয় যা দিয়ে ১ হাজার ৫০০ কারিগর কয়েক বছরের শ্রম দিয়ে ২৬ হাজার ৩০০টি দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করে। তৎপর এ মূর্তিগুলো ভারত থেকে শ্রী স্বামী নারায়ণ মন্দিরে আনা হয় এবং যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়।

www.pathagar.com

মন্দির সংলগ্ন প্রদর্শনী কক্ষগুলোতে প্রবেশ করতে হলে মাশুল দিতে হলো জনপ্রতি ২ পাউন্ড করে। প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু মতবাদ ও আদর্শকে পরিস্ফুটিত করা। বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কোথায় এবং কিভাবে এটা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছিল, হিন্দু তত্ত্বের মহিমা এবং মূল্যবোধ এবং সমাজ ও সংসারে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে এর অবদান ইত্যাদি গবেষণাপ্রসূত তথ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথমেই হিন্দু ধর্মের স্থিতিতত্ত্বের গূঢ় রহস্যমূলক 'ও'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ঐশ্বরিক অক্ষরটির শুধু উচ্চারণ নয়, এর পুরো তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে মনপ্রাণ দিয়ে গভীর নিষ্ঠার সাথে এক 'ওয়াম' শব্দটি জপ করতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে দৈব অনুভূতি, তেজ এবং প্রগাঢ় শান্তি। এ শব্দটির প্রকৃত অনুভূতি জীবনের তিনটি স্তর থেকেই পাওয়া যায়। প্রথম স্তর-জাগ্রত জগতে 'ওয়াম' শব্দের গুরুগম্ভীর ধ্বনি প্রত্যেকের মনেই রেখাপাত করে। দ্বিতীয় স্তর অবচেতন অথবা স্বপ্ন জগত। এ জগতে অবস্থানকালে 'ওয়ামের' একটা প্রচ্ছন্ন সুরের রেশ হৃদয়কে অচ্ছন্ন করে রাখে। তৃতীয় স্তর সুসুপ্তি জগত অর্থাৎ গভীর নিদ্রা কিংবা প্রায় চিরনিদ্রার জগত। 'ও' জপের ধারাবাহিকতা জপকারীকে তিনটি স্তরেই স্বর্গীয় অনুভূতি, শক্তি, সাহসও যোগায়।

ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারেই মন্দিরের দ্বিতলে প্রবেশ করলাম এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর মর্মর মূর্তি এবং নিপুণভাবে খোদাইকৃত সাজ-সরঞ্জাম বেশ কিছুটা সময় নিয়েই দেখলাম। এরপর আমি নিচ তলাতে প্রদর্শনী দেখতে অগ্রসর হলাম। প্রবেশপথেই ২ পাউন্ডের টিকিট কাটতে হলো। কক্ষসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং সব স্থানই অত্যন্ত মূল্যবান কার্পেটে ঢাকা। স্তিমিত আলো এবং অতি শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেয়াললিপি দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। দেয়াললিপি থেকে জানতে পারলাম যে, বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ধর্মের উৎপত্তি স্থান হচ্ছে সিন্ধু অববাহিকা এবং সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০০ সালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই হলো সর্বপ্রাচীন এবং সেটাই ছিল হিন্দু সভ্যতা। ক্রমবিকাশের ফলে আমরা দেখতে পেলাম ৫০০০ বছর পূর্বেকার হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর কিছু ছিটেফোঁটা বিবরণ।

দেয়াললিপি থেকেই আদি হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা ও বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে অবহিত হলাম। হিন্দু ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতমনা সুধীজনদের আবেগ, কৃতকর্মের জন্য আহরিত ন্যায় ও অন্যায় বোধ

www.pathagar.com

থেকে প্রার্থনা এবং উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভূত দিকনির্দেশনাই জন্ম দিয়েছে বেদ শাস্ত্রের। ভগবানের অস্তিত্ব তারা খুঁজে পেতেন সর্বকর্মে এবং পাপী-তাপী যেই হোক সত্যের অন্বেষণে যে পথে তারা এগিয়ে চলত সেই ছিল তাদের ধর্ম।

হিন্দু ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. স্রষ্টা– সর্বশক্তিমান একক সত্তা।

২. অবতারবাদ– স্রষ্টাই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হন এবং ধর্মের ধ্বজাকে জাগ্রত ও সমুন্নত রাখেন।

৩. কর্মবাদ– আত্মা কর্মের মধ্য দিয়ে জীবিত ও জাগ্রত থাকে। এই কর্মফলের জন্যই জাগ্রত ভুবনে এবং সুপ্ত ভুবনে শান্তি ও শাস্তি পায়।

৪. পুনর্জন্ম– আত্মা অমর তাই একে জন্ম জন্মান্তরে এই ভুবনে আবির্ভূত হতে হয় এবং এখানেই থাকতে হয় যতদিন না আত্মা মহামুক্তি পায়। মহামুক্তির শর্ত হচ্ছে সব পাপ স্খলনের পর পরম সত্যের উদ্ভাসন হয় এবং তখনই সেই আত্মা ইহলোক থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবানের সেবায় চিরকালের জন্য নিয়োজিত হয়ে যায়।

জীবনে চলার পথে কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় ধর্মের শাসন ও অনুশাসনের মাধ্যমে। তাই ধর্ম ন্যায় ও সত্য পথে চলার বাহন।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্যই মূর্তির আবির্ভাব। ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য মূর্তি একটা অবলম্বন মাত্র। মূর্তিকে পূজা করা হয় না। পূজা করা হয় মূর্তির পেছনে যে দেব কি দেবী থাকে তাকে। সাধারণ লোকের পক্ষে এই উপলব্ধি করা সহজ নয়– তাই প্রতিমার প্রবর্তন ও প্রচলন।

প্রদর্শনীর অন্য এক সভ্যতা প্রায় ৫০০০ বছর পুরনো হলেও মিসরীয় এবং মেসেপোটেমিয়ার সভ্যতার মতো অবলুপ্ত হয়নি। বৃহৎ দেশ ভারতে নিত্যনতুন বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং অনেকে এখানে থেকেও গেছে। তারা ভারতীয় জনসমুদ্রের সাথে মিশে গিয়ে এক দেহে লীন হয়ে গেছে। ভারতীয় সভ্যতাকে তারা সমৃদ্ধ করেছে। এভাবেই মুসলমানরা এখানে এসেছে মধ্যপাচ্য থেকে এবং এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে এবং বিগত ১৫০০ বছর ধরে এখানে এসে ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই অবিভক্ত ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ।

www.pathagar.com

এই প্রদর্শনী থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, বহু গুণীজ্ঞানী মনীষী এবং ইতিহাসবেত্তারা বলে গেছেন যে, ভারতীয় সভ্যতায় জাগতিক চাহিদাকে মূল্য দিয়েছে ততটুকুই যতটুকু সাধারণভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। তাই হিন্দু সভ্যতায় ভোগ থেকে ত্যাগের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। দয়া-মায়া, ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগের মহিমাকে মহীয়ান করে দেখানো হয়েছে। এ প্রদর্শনীর দেয়াললিপিতে পুরো কাহিনীভিত্তিক সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থিব ধন ও দৌলতের প্রতি কতটা অনীহা ছিল।

বেদ গ্রন্থ হচ্ছে হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থ এবং এই বেদ পাঠের মধ্য দিয়েই এরা ইহকাল ও পরকালের জ্ঞান অর্জন করে এবং বেদের শিক্ষার মাধ্যমেই জীবনযাপন করে মহামুক্তি লাভ করে। হিন্দু ধর্মে চার প্রকার বেদের উল্লেখ আছে ।

১. রিগ বেদ...এখানে ১০৫৫২টি পুণ্য শ্লোক ও মন্ত্র রয়েছে

২. আয়ুর্বেদ... এখানে ১৯৭৫টি পুণ্য শ্লোক ও মন্ত্র রয়েছে

৩. সামবেদ...এখানে ১৮৭৫টি পুণ্য শ্লোক ও মন্ত্র রয়েছে

৪. অথর্ববেদ...এখানে ৫৯৮৭টি পুণ্য শ্লোক ও মন্ত্র রয়েছে

হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ এই মন্দিরে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অবদান (বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষা), শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বের সর্বপ্রাচীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের তক্ষশিলাতেই ২৭০০ বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল। (পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে তক্ষশিলাতে অবস্থিত আর্কিওলজিক্যাল সাইট দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে)।

এ মন্দিরের একটি স্থানে দেখতে পেলাম, মন্দির কর্তৃপক্ষ দাবি করছে যে অংক শাস্ত্রের শূন্য সংখ্যাটি ভারতীয় অঙ্কবিদদেরই উদ্ভাবন। দশমিক প্রথা, জ্যামিতি শাস্ত্রের বিকাশসাধন, সাধারণ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে ভারতীয়দের অবদানের ধারাবাহিক বিবরণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ প্রদর্শনীতে। সর্ববিষয়েই ভারতকে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখানোই এই প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এবারে যে সেকশনটিতে প্রবেশ করলাম সেটা হচ্ছে এ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা প্রভু স্বামী নারায়ণের (১৭৮১-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত। স্বামীর জীবনবৃত্তান্ত , তার আদর্শ, দর্শন, মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়াদি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ সেকশনে। স্বামী নারায়ণ বিশ্বাস বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামী নারায়ণ শিশুকাল থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমা অনুধাবনের জন্য দীর্ঘদিন দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেছিলেন এবং জীববৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি বৈচিত্র্য অবলোকন করে ভগবানের সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেন। ভগবানকে গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করেন। এভাবেই তিনি তার জ্ঞানের প্রসার ঘটান এবং ২১ বছর বয়সেই নিজেকে স্বামী নারায়ণ বিশ্বাসের ধর্মগুরু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি বিশেষভাবে কাম ও ক্রোধ বর্জিত, লোভ বিবর্জিত আস্থা গঠনের তাগিদ দেন, মদ, মাংস ও উত্তেজক পানাহার বর্জন করার নির্দেশ দেন। এভাবেই ধর্মে আসক্তি, অহিংস পথ ও পন্থা অবলম্বন এবং নেশাযুক্ত দ্রব্যাদি পরিহারের মাধ্যমে সৎ সহজ ও সরল পথ অবলম্বনের নির্দেশ তিনি প্রদান করেন।

স্বামীজীর মৃত্যুর পরও প্রায় ১৭৫ বছর গত হয়েছে কিন্তু তার শিষ্যরা তার ধর্মমত অতি নিষ্ঠার সাথে আজও প্রচার করে যাচ্ছে। বর্তমানে পূজ্য প্রমুখ স্বামী মহারাজ হচ্ছেন এ বিশ্বাসের পঞ্চম গুরু। স্বামী নারায়ণ মন্দির যদিও হিন্দু মন্দির তবু এটাকে আমাদের দেশের সনাতন হিন্দু মন্দির থেকে আমার কাছে অনেকখানি আলাদা মনে হলো। এই মন্দিরে ভগবানকে পূর্ণভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে তবে আত্মার মুক্তি লাভের জন্য স্বামী নারায়ণ পন্থা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়েছে।

উপাসনালয় যে প্রকারই হোক না কেন প্রতিটি মন্দির, মসজিদ, গির্জা এবং উপাসনালয়ের একটা বিশেষ আবেদন থাকে। মনে হয় পবিত্রতা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সেখানে যতক্ষণ অবস্থান করা যায় মনে হয় সেই সময়টাতে শান্তির পবিত্র বাতাস আত্মাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে।

মন্দিরে আমাদের আগমন সার্থক হয়েছে বলে মনে হলো। আমরা একটা ভিন্নমত ও দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলাম এবং তৃপ্তির সঙ্গেই ঘণ্টা দুই পর মন্দির দেখে আমাদের যাযাবরি পথে সামনে অগ্রসর হলাম।

ঘরে ফেরার পথে আমরা ভাবলাম যে, ব্রিটিশ লাইব্রেরিটা দেখে যাই। সেই মতে

www.pathagar.com

টিউবে করে আমরা সেন্ট প্যাংক্রিয়াস স্টেশনে এসে নামলাম এবং বেশ খানিকটা পথ চলে ব্রিটিশ লাইব্রেরি চত্বরে পৌছলাম। সুধী পাঠকের জ্ঞাতার্থে এই লাইব্রেরির কিছু কিছু দিক তুলে ধরার প্রচেষ্টা করব।

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ Reference Library অর্থাৎ তথ্য সন্ধান গ্রন্থাগার হচ্ছে ব্রিটিশ লাইব্রেরি। এ অনন্য সাধারণ লাইব্রেরি সম্বন্ধে কিছু তথ্য সুধী পাঠকের খেদমতে পরিবেশন করে যেতে চাই।

এখানকার Conservation and Preservation Department অর্থাৎ পুস্তক সংরক্ষণ বিভাগে বর্তমানে ১৩০ জন অত্যন্ত উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত আছে এবং শুধু সংরক্ষণের জন্য এ বিভাগের বার্ষিক বাজেট হচ্ছে ৫০ লাখ পাউন্ড যা আমাদের মূল্যমানে দাঁড়ায় ৬০ কোটি টাকা। কাগজে মুদ্রিত বই সংরক্ষণ ছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে সংগৃহীত পশু চর্ম, প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত নলখাগড়া , তালপাতা এবং বিভিন্ন ধরনের পল্লব ও গাছের বাকলের পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে। এসব প্রাচীন সংগৃহীত দলিল-দস্তাবেজসমূহ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে মাইক্রো ফিল্মে রূপান্তরিত করে দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাও এ বিভাগের দায়িত্ব।

সেন্ট প্যানক্রিয়াসে অবস্থিত বিশাল লাইব্রেরিতে শুধু এই ধরনের কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ সেকশন রয়েছে। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে সদাসর্বদা উন্নত করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, কলোনি এবং স্থান থেকে আহরিত বহু মূল্যবান নথিপত্র এ লাইব্রেরিতে অতি যত্নসহকারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ৪৫০০ বছর আগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রক্ষিত এসব দলিল প্রায় ২০০টি বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে। হস্তলিপি, চর্মলিপি, কাপড়ের ওপর লিখিত দলিলাদি এবং হস্তাঙ্কিত তৎকালীন সামাজিক চিত্রসমূহ সযত্নে ধারাবাহিকভাবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে অতি অল্প সময়ে বিশাল সংগ্রহের স্তূপ থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে ও অনায়াসে কাঙ্ক্ষিত দলিলটি বের করে আনা যায়। এ ধরনের সংগ্রহের আর একটা কেন্দ্রও ব্রিটিশ লাইব্রেরি দেখাশোনা করছে ব্লুমস্‌বারি স্টুডিওতে।

বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পাঠাগার হিসেবে ব্রিটিশ লাইব্রেরি

www.pathagar.com

ভবনটি নির্মিত হয়। এখানে ১১টি পাঠ কক্ষে ১২০০টি পাঠ্যাসন রয়েছে। ভূনিম্ন ৪টি স্তরে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ ফিট নিচু পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল পাঠাগারে যে সেলফ অর্থাৎ তাকগুলো রয়েছে তা এক লাইনে সাজিয়ে রাখলে দৈর্ঘ্যে ২১৭ কিলোমিটার হবে। প্রতিটি তাক উচ্চতায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। যান্ত্রিক উপায়ে এবং কম্পিউটারের সাহায্যে লাখ লাখ পুস্তকের ভাণ্ডার থেকে কাঙ্ক্ষিত কিতাবটি পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্য টেবিলে আনতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে।

এই লাইব্রেরি ভবন এবং লাইব্রেরি পরিচালনা ব্যবস্থায় প্রায় ১০০০ অফিস কর্মী নিয়োজিত আছে। ভূনিম্নের ৫টি তল এবং ভূপৃষ্ঠের উপর ৯টি তলের মেঝের আয়তন ১১২০০০ বর্গমিটার অর্থাৎ প্রায় ১২ লক্ষ বর্গফিট। লন্ডন শহরের অন্যতম বৃহৎ ভবন এ লাইব্রেরি নির্মাণে খরচ হয়েছিল ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বর্তমান মূল্যমানে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ কোটি টাকা। উপলব্ধি করুন কত মূল্যবান সম্পদ এই ভবনটিতে সংরক্ষিত আছে। এগুলো সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রতি বছর কয়েক শ কোটি টাকা বরাদ্দ করে থাকে।

বর্তমানে এখানে ১ কোটি ২৫ লাখ বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, ৪০ লাখ ম্যাপ, ৩,১০,০০০ হস্তলিপি, ৮০ লাখ পোস্টাল স্ট্যাম্প এবং এ ধরনের আরো লাখ লাখ দ্রষ্টব্য রয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২০০০-২০০১ সালে শুধু লাইব্রেরিতে পাঠ করার উদ্দেশ্যে ৪ লাখ ৩১ হাজার পাঠক এসেছিলেন। ৫৩ লাখ লোক শুধু আলোচনার জন্য এবং ৩,৬৫,০০০ লোক প্রদর্শনী গ্যালারি দেখার জন্য এসেছিলেন। ১ কোটি ৫৩ লাখ লোক এ লাইব্রেরির ওয়েবসাইট খুলে দেখে।

আজ বেশ লম্বা দিনই কাটলো এবং পরিশ্রান্ত দুই পথিক দিন শেষে ঘরের পথ ধরলাম।

www.pathagar.com

সতের.

টেইট গ্যালারি উলফগ্যাং টিলম্যান মিউজিয়াম ও কুইন মেরির রোজ গার্ডেন

লন্ডন ভ্রমণের দিনগুলো একে একে শেষ হয়ে এল প্রায়। বিগত কয়েকটা দিন অন্যান্য সাংসারিক ও সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখার উচ্ছ্বাসকে দমন করতে হয়েছিল। আজ পুনরায় ২৯ জুলাই মঙ্গলবার টেইট গ্যালারির উলফগ্যাং টিলম্যান মিউজিয়াম দেখতে গেলাম।

দিনটা ছিল সুন্দর। আবহাওয়া ঝরঝরে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। তাই সমগ্র পরিমণ্ডলই যেন ছিল তাপ নিয়ন্ত্রিত। এরূপ দিনে পায়ে হেঁটে আরাম। সার্কেল লাইন ধরে অক্সফোর্ড স্টেশন থেকে টেমস নদীর উত্তরে পিমলিকো টিউব স্টেশনে গিয়ে নামলাম। সেখান থেকে নদীর ধারের রাস্তা মিলব্যাক ধরে অগ্রসর হলেই উলফগ্যাং টিলম্যান মিউজিয়ামে পৌঁছে যাওয়া যায়। আজ আমার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এই মিউজিয়ামের টেইট গ্যালারিটি দেখা। নিচতলা থেকেই দেখা শুরু করলাম। আমাদের সনাতন ধ্যান-ধারণার সাথে এই মিউজিয়ামের চিত্র শিল্পের মিল রয়েছে তাই দেখে আনন্দই পাচ্ছিলাম। টেইট মডার্নে কিন্তু আমাদের প্রাচীন চিন্তাধারার সাথে কোনো মিল খুঁজে পাইনি। এই উলফগ্যাং টিলম্যান মিউজিয়ামে ১৫০০ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ব্রিটেনে চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটেছে তার একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

দেখলাম ভিক্টোরিয়ার আমলের (১৮৩৭-১৯০১) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর্ট। এই সময়টাকে ইংল্যান্ডের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। কেননা এ সময়ে অর্থনৈতিক,

www.pathagar.com

সামরিক এবং কূটনৈতিক বিচার-বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ ছিল ইংল্যান্ড। শিল্প ও সাহিত্যে, চারুকলা, ললিতকলার ক্ষেত্রেও ইংল্যান্ড তখন বিশ্বে একটি উঁচু স্থান দখল করে ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর ও দক্ষিণে এতটা বিস্তৃত ছিল যে, সে যুগের প্রবাদ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। মিউজিয়ামের বিভিন্ন কক্ষের দেয়ালে টানানো বিভিন্ন যুগের ছবির মাধ্যমে সেই যুগটাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সারাদিন ধরে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন যুগের নামকরা শিল্পীর চিত্রগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখলাম এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করলাম। দেখলাম অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড।

১৭৬৮ সালে রয়াল অ্যাকাডেমি স্থাপিত হয় রাজা তৃতীয় জর্জের সমর্থন ও সহায়তায়। টেইট গ্যালারি বলতে শুধু এখানকার এই গ্যালারিটিকেই বুঝায় না। ৪টি গ্যালারির সমন্বয়ে গঠিত এ গ্যালারিটি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত টেইট ব্রিটেন, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত টেইট লিভারপুল, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত টেইট সেন্ট অইভ্স্ এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত টেইট মডার্ন নিয়ে পূর্ণ টেইট গ্যালারি। টেইট মডার্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখেছি এই বইয়েরই পঞ্চদশ অধ্যায়ে।

টেইমস নদীর তীরে মিলব্যাংক পিমলিকোতে স্থাপিত এই টেইট ব্রিটেনই সর্বপ্রাচীন এবং এর উৎস খুঁজলে দেখা যায় যে, হেনরি টেইট নামক এক চিনির কারবারির অর্থায়নে এই গ্যালারিটি স্থাপিত হয়। তিনি শুধু অট্টালিকা তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের সংগৃহীত ভিক্টোরিয়া আমলের পেইন্টিংসমূহও এই গ্যালারিতে দান করেন। টেইটকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার জন্য আরো অনেকেই তাদের সংগ্রহ এখানে দান করেছেন। এভাবেই বিভিন্ন আর্টপ্রেমিকদের আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই টেইট গ্যালারি আজ আমরা পেয়েছি। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, ইংরেজরা তাদের দেশকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার জন্য নিজেদের সম্পত্তি অকাতরে বিলিয়ে দেয় যার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল। এভাবেই একটি দেশ সরকারি সাহায্যে নয় বরং জনগণের সাহায্যে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

যারা প্রথম পর্যায়ে এই গ্যালারি স্থাপন করেছিলেন তারা তো গত হয়েছেন কিন্তু এখনো বিভিন্ন উপায়ে টেইট গ্যালারিকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তোলা হচ্ছে টেইট ফাউন্ডেশনে স্থাপনের মাধ্যমে। ফাউন্ডেশনের কাজ হচ্ছে আরো অনেক

www.pathagar.com

পেট্রোন অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ করা এবং নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে টেইটকে আরো বড় ও প্রসিদ্ধ করে গড়ে তোলা।

বর্তমানে এই টেইট গ্যালারিতে ১৫০০ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য ছবিসমূহ রয়েছে। উইলিয়াম ব্লেক, জন কনস্টেবল, উইলিয়াম হোগার্থ এবং জে এম ডব্লিউ টার্নারের ছবিগুলো টাঙানো আছে টেইট ব্রিটেনের দেয়ালে। টার্নার সাহেব ৫০ বছরের চেয়ে কম বয়সী ব্রিটিশ আর্টিস্টদের জন্য প্রতি বছর কয়েকটি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এই পুরস্কার চালু করা হয় এবং বর্তমানে এই পুরস্কারকে অত্যন্ত মূল্যবান প্রাপ্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

টেইট ব্রিটেনের বিভিন্ন কক্ষে রক্ষিত চিত্রগুলো শুধু একবারের মতো চোখ বুলিয়ে গেলাম তাতেই প্রায় সারাটি দিন কেটে গেল এবং পদযুগল অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। আরো খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কয়েক সপ্তাহের প্রয়োজন। আমার তো আর অত সময় নেই তাই দেখে গেলাম- এই স্বাদটুকু নিয়েই বিদায় নিতে হলো।

কয়েকটা দিন বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি দেখে দেখে জীবনটা মনে হচ্ছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানব সৃষ্ট কৃত্রিম পদার্থ দেখে মনটা যেন অন্তর্মুখী হয়ে গেছে তাই প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য পরদিনই ৩০ জুলাই ২০০৩ বুধবার বেরিয়ে পড়লাম আমার পুত্র জিয়াকে নিয়ে Regent Park অঞ্চল ভ্রমণে। মনে পড়ে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যখন লন্ডনে ডেপুটি নেভাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম তখন আমার দুই কন্যাকে নিয়ে প্রায়ই রিজেন্ট পার্কে আসতাম। জিয়া তখনো জন্মগ্রহণ করেনি বলে জিয়াকে নিয়ে লন্ডন দেখা হয়নি। গতকাল রাতেই জিয়া লন্ডনে এসেছে কয়েকদিনের জন্য। আমার পায়ে হেঁটে লন্ডনের কার্যক্রমের রোমাঞ্চকর গল্প শুনে আমার সাথে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে এবং তার আগ্রহেই রিজেন্ট পার্কের দিকে আজ রওনা হলাম। প্রায় ৫০ বছর আগে বীথি ও দীপ্তির তাগিদে রিজেন্ট পার্কে যেতাম প্রধানত রিজেন্ট পার্কের চিড়িয়াখানা দেখার জন্যে। চিড়িয়াখানা দেখার শখ এখন নেই। এবারে যাচ্ছি বিশ্বখ্যাত রানী মেরির রোজ গার্ডেন (গোলাপ বাগান) দেখার জন্য। টিউবে করে আমরা রিজেন্ট পার্ক টিউব স্টেশন পর্যন্ত এলাম। এবারে পদযাত্রা। ধীরে ধীরে প্রায় আধা মাইল পথ হেঁটে আমরা এক সময় পার্কের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। সামনে সবুজ কার্পেটের মতো সুন্দর মসৃণ ঘাসের প্রাঙ্গণ দেখে মনে হলো একটু বসে যাই। তাই আমরা সেখানে বসেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কার্যকলাপ অবলোকন করতে থাকলাম। আমাদের মতো অনেকেই ঘাসের ওপর পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে। দিনটাও ছিল পার্কে উপভোগ করার মতোই। অনেকেই জগিং করছে অর্থাৎ মৃদু পায়ে দৌড়োচ্ছে। শিশুরা বাপ-মায়ের আশপাশেই দৌড়-ঝাঁপ করছে। তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে জড়িয়ে উন্মুক্ত মাঠেই যৌবনকেলিতে ব্যস্ত। এ দেশে এটা খুব একটা বিসদৃশ মনে হয় না। একটু দূরেই দেখলাম খেলাধুলার মাঠ। আমরা গাত্রোত্থান করে সেদিকেই অগ্রসর করলাম। পথে এক সবুজ প্রান্তরে দেখলাম কিছু 'টিন এজার' অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীরা 'ফ্রিজবি' (এক ধরনের প্লাস্টিকের চাকতি) নিয়ে খেলা করছে। কে কতটা দূরে নিক্ষেপ করতে পারে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা। চারদিকেই যেন আনন্দের মেলা বসেছে।

লেকে বিভিন্ন জাতের হাঁস সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতের পাখিদের ওড়াউড়ি এবং তাদের কিচিরমিচির দর্শনার্থীদের অন্য একটা ভুবনে নিয়ে যায়। লেকের ধার মখমলসম সবুজ ঘাসে আবৃত এবং এই ঘাসের গালিচার ওপর শুয়ে বসে দর্শনার্থীরা চারদিকের আনন্দোচ্ছল দৃশ্য উপভোগ করে এবং পাখিদের সাথে খেলা করে। পাখিরা খাবার লোভে দর্শনার্থীদের হাতের নাগালে চারদিকে ঘোরাফেরা করে।

লেকের ধারে গাছের ছায়ায় এখানে-ওখানে আমাদের দেশীয় স্টাইলের ইজি চেয়ার রেখে দেয়া হয়েছে যেখানে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং আয়েশী লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। আমি ও জিয়া ঘাসেই বসতে পারতাম কিন্তু যখন দেখলাম যে খালি ইজি চেয়ার পড়ে রয়েছে তখন আমরা দু জনে দুটো চেয়ার টেনে বসে গেলাম। মাত্র মিনিট তিনেক বসেছি– এক উর্দি পরা পার্ক অ্যাটেন্ডেন্ট এসে দুটি চেয়ার ব্যবহারের জন্য দুটো পাউন্ড স্টারলিং নিয়ে গেল। আমরা অকারণেই এই খেসারত দিলাম। ইংল্যান্ডে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে এক ঘণ্টা চেয়ার ব্যবহারের জন্য এক পাউন্ড খরচ করা মামুলি ব্যাপার মনে করে কিন্তু আমরা যারা টাকায় অভ্যস্ত তাদের জন্য কয়েক মিনিট বসার জন্য এক পাউন্ড অর্থাৎ ১০০ টাকা খরচ করাটা খুবই বেদনাদায়ক। এভাবে পাউন্ডের বদলে টাকায় হিসাব করলে আমাদের মতো পর্যটকদের লন্ডনে সব সময়ই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এক কাপ চা খাবেন ৪০০ টাকা। পথের ধারে মামুলি স্ন্যাক খাবেন ৫০০ টাকা,

www.pathagar.com

অতিসাধারণ মানের দুপুরের খাবারের জন্য আপনাকে দিতে হবে ১০০০ টাকা। তাই টাকা হিসাব করলে আমাদের পক্ষে লন্ডনের জীবন বেশ অপ্রীতিকর মনে হবে। ইংরেজিতে কথা আছে 'Be a Roman when you are in Rome' অর্থাৎ রোমে যখন থাকবেন তখন রোমবাসীর মতোই ব্যবহার করুন। ইংল্যান্ডের পর্যটকরাও যে কদিন ইংল্যান্ডে থাকবেন সে কদিন ব্রিটিশদের মতোই ব্যবহার করুন। তাহলেই খেয়ে-পরে আনন্দ পাবেন অন্যথায় টাকা-পাউন্ডের হিসাব মিলাতে গিয়ে অভুক্তই থাকতে হবে। ভ্রমণটা নিরানন্দেই পরিণত হবে।

এসব নানা দৃশ্য অবলোকন করতে করতে এবং পথ চলতে চলতে এক সময় রিজেন্ট পার্কের ইনার সার্কেলের প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। ইনার সার্কেলের ভেতরে রয়েছে একটা বৃত্তাকার উদ্যান। এখানেই রয়েছে রানী মেরির গোলাপ বাগান। প্রায় ৪০০ প্রকারের গোলাপের সমাহার ঘটেছে এখানে। গোলাপ বাগানের চত্বরের বাইরে আউটার সার্কেলে রয়েছে জুলজিক্যাল গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং প্রায় ১০০ একরব্যাপী খেলার মাঠগুলো। তা ছাড়া বিগত শতাধিক বছরে এখানে গড়ে উঠেছে কৃত্রিম হ্রদ, বিভিন্ন আকার ও প্রকারের রাজকীয় প্রাসাদোপম বিলাস ভবনগুলো। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বাগানটির ডিজাইনার এবং আর্কিটেক্ট ছিলেন জন ন্যাস। রাজা অষ্টম হেনরি এই বাগানটির জন্য স্থান

রিজেন্ট পার্কের সুসজ্জিত সেতু। ছবিতে জিয়াকে দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

বরাদ্দ করেছিলেন। ইনার সার্কেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে আগন্তুকদের সুবিধার্থে এবং মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটা উন্মুক্ত ও আবৃত রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটেরিয়া, স্ন্যাক বার ইত্যাদি। লেক সাইড ব্যান্ড স্ট্যান্ড, থিয়েটার এবং শিশুদের জন্য নানা ধরনের ভূখণ্ডে হাউস অর্থাৎ খেলাঘর দর্শনার্থীদের আনন্দ যোগায়।

আমরা এবারে লেইকের ওপর অতি সুসজ্জিত একটি পুলের ওপর দিয়ে লেক অতিক্রম করলাম এবং ইনার সার্কেলের প্রবেশপথ ধরে অগ্রসর হলাম। এখানেই অতি অলঙ্কৃত একটা রক গার্ডেন রয়েছে এবং রক গার্ডেনের ভেতরে এঁকে-বেঁকে রয়েছে একটা নীল জলের হ্রদ এবং সেখানে আছে লাল, নীল, সাদা, কালো এবং রঙ চঙয়ে নানা জাতীয় মাছ। প্রতিটি প্রায় ৫-৬ কেজি ওজনের হবে। মনে হয় বিরাট একুরিয়াম। রক গার্ডেন পার হয়ে আমরা রোজ গার্ডেনে প্রবেশ করলাম। সামনেই সুপ্রশস্ত রাস্তা যাকে এরা ব্রডওয়ে নামে অবহিত করে থাকে। ব্রডওয়ে দিয়ে কিছু দূর গিয়ে আমরা প্রসিদ্ধ কুইন মেরির গোলাপ বাগানে পৌঁছলাম।

ছোট ছোট ভূখণ্ডে একই জাতীয় গোলাপ লাগানো হয়েছে। তার পাশেই আর একটা ভূখণ্ডে অন্য ধরনের এবং অন্য রঙের গোলাপ। এভাবেই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে হরেক রঙের এবং হরেক রকমের গোলাপ বাগান। প্রত্যকটি ভূখণ্ডে রোপিত গোলাপের নাম লোহার ফলকে লেখা আছে। যেমন Ingrid Bergman, Silver Jubilee, Savoy Hotel, Remember me, Beauty star, Lucky star ইত্যাদি প্রকারের গোলাপ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো গোলাপ বাগানের পাশে বসেই অনেকটা সময় কাটালাম এবং উপভোগ করলাম।

প্রচুর লোকের সমাগম হয় এই রোজ গার্ডেনে। বসে বসে চারদিক দেখতেই শুধু মন চায় কিন্তু সেটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে তো সময়ের বাধ্যবাধকতা আছে। তাই এই সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে হলো। এগিয়েই চললাম এবং ধীরে ধীরে পার্ক থেকে বের হয়ে আমরা বেকার স্ট্রিটের কোনায় এসে পৌঁছলাম। সামনেই নজরে পড়ল প্রসিদ্ধ সারলক হোমসের মিউজিয়াম। ২২১-বি নম্বরের বাড়িটির কোনো আভিজাত্য নেই– একটা সাদামাটা বাড়ি তবু সারলক হোমসের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি ইংরেজরা রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছে। বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে সারলক হোমসের গুরুত্ব বিচার করলে হয়তোবা আঁস্তাকুড়েও স্থান পাবে না। কিন্তু ইংরেজরা তাদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এককালে সমাদৃত এবং প্রশংসিত সারলক হোমসকে শুধু ইতিহাসের পাতায়ই স্থান দেয়নি বরং সরেজমিন তার স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল রাখার

www.pathagar.com

জন্য ১৮৮১ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যে বাড়িতে বসবাস করতেন তাকেও এরা মিউজিয়ামের রূপ দিয়েছে। এরা বেনেদের জাত তাই এখানে পয়সা না ঢেলে টিকিট করে মিউজিয়াম দেখার ব্যবস্থা করেছে এবং সে সাথে দু পয়সা রোজগারেরও ব্যবস্থা করেছে। এই অর্থে মিউজিয়ামটির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মিটিয়েও হয়তো উদ্বৃত্ত থাকে। দেখলাম লেখা আছে আপনি ১০ লক্ষতম দর্শনার্থীর গৌরব যে কোনো দিন পেতে পারেন।

এই সারলক হোমসটা কে তা পাঠক জানতে চাইবেন তাই জানাচ্ছি যে, তিনি ছিলেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ যার কাজ ছিল নীরবে নিভৃতে যে অন্যায় সমাজের বুকে অহরহ ঘটে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রচলিত পুলিশ দিয়ে সে সব অপরাধ ও সত্যকে অনুসন্ধান করে তার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়- সেসব অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা। অনেকটা পশ্চিম বাংলার বোমকেশ বক্সির ধাঁচের সত্যান্বেষী যিনি জটিল রহস্যের জট ছাড়ান।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই আমাদের সামনে এল ম্যাডাম টুসাঁর মোমের মিউজিয়াম এবং তৎসংলগ্ন মহাকাশ অবলোকনের জন্য নির্মিত প্লেনটরিয়াম। এখানে সব সময়ই প্রচণ্ড ভিড় থাকে। মনে পড়ে এই মিউজিয়ামে আরো কয়েকবার এসেছি এবং কখনো ঘণ্টা দেড়েক লাইনে না দাঁড়িয়ে টিকিট পাইনি। আজকেও অবস্থা তথৈবচ। অবশ্য আজ আমাদের মোমের মিউজিয়াম দেখার কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

বিকেল হয়ে এসেছে তাই ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করলাম। বিশেষ করে জিয়া দীর্ঘ বিমান ভ্রমণের পর এখনো ভালো করে বিশ্রাম নেয়ার সময় পায়নি তাই ঘরের পানে রওনা হলাম।

www.pathagar.com

আঠার.

হাইড পার্ক

১ আগস্ট শুক্রবার আমার কন্যার বিয়ে তাই সকলেই ভীষণ ব্যস্ত। এক মুহূর্তেরও ফুরসত নেই। বিয়ে উপলক্ষে রোম থেকে আতিক ও তার পরিবার লন্ডনে পৌঁছেছে ৩০ তারিখ রাতে। কথায় কথায় আমার পায়ে হেঁটে লন্ডনের কিচ্ছা ও কাহিনী তারা সবাই অবগত হয়েছে এবং পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখার শখ সবারই মনে জেগেছে। আমার ভ্রাতৃবধূ এমিলির আর তর সইছে না। বায়না ধরে বসল যে, কাল বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই তাকে নিয়ে অবশ্যই যেন লন্ডনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে যাই। অগত্যা সাব্যস্ত হলো যে, সকালের নাশতার পর আমি এমিলি এবং জিয়া হাইড পার্কের দিকে যাব।

মধ্য লন্ডনে ৬৩০ একর ভূমির ওপর অবস্থিত হাইড পার্ক ও তৎসংলগ্ন কেনসিংটন গার্ডেন পার্ক প্রতিটি লন্ডনবাসীর একান্ত আপন ও মনোরম অবকাশ কেন্দ্র। ছুটিছাটার দিনে কিংবা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে এই পার্কটি আনন্দ প্রত্যাশীদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। কেন? এর জবাব দিতে গেলে বলতে হয়– হাতের নাগালে এত বড় একটা বিনোদন পার্ক প্রকৃতিকে যেখানে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া হয়েছে এবং আধুনিককালের উদ্যান বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে উদ্যানের প্রতিটি স্থান সুন্দর ও মনোরমভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে যাওয়ার লোভ কার না হবে? শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা যাবে না তবু একটা মোটামুটি ধারণা দেয়া যাবে। তাই সেদিকেই মনোনিবেশ করছি। হাইড পার্কে ছেলে-বুড়ো অর্থাৎ নবীন ও প্রবীণ সবাই চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত পরিবেশ পায় তাই এখানে আসে। সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বনভূমি যেখানে চার-

www.pathagar.com

পাঁচ হাজার বড় বড় বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, উন্মুক্ত সবুজ ঘাসের বিশাল প্রাঙ্গণ যেখানে তরুণ-তরুণীরা দৌড়ঝাপ করছে, এখানে-ওখানে সযত্নে গড়ে তোলা ঝোপঝাড়, ফুলের উদ্যান, সব এলাকা ঘিরে আঁকাবাঁকা ব্যক্তিগত গাড়ির রাস্তা মোটরযান আরোহীদের দেয় যেখানে খুশি সেখানে গিয়েই অবস্থান করার অবাধ স্বাধীনতা, রাস্তার ধারে কুঞ্জবনের গাছের ছায়ায় আড়ালে-আবডালে বসবার পার্ক বেঞ্চসমূহ মনের মতো স্থানে নীরবে নিভৃতে কিছুক্ষণ বসে থাকার অবকাশ যোগায়, লেকের ভেতরেই রয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত সারপেন্টাইন লেক যেখানে ছোট ছোট প্রমোদ তরী রঙ-বেরঙের পাল তুলে এদিক ওদিক যাওয়া-আসা করছে, দাঁড় বাওয়া ডিঙ্গি বিক্ষিপ্তভাবে চলাফেরা করছে, সাপের মতো আঁকাবাঁকা লেক পারাপারের জন্য রয়েছে সুন্দর সেতু, লেকের জলে রয়েছে নানা জাতীয় মাছ, বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে রয়েছে অশ্বারোহণের পথ যেখানে ভাড়া করা ঘোড়ায় চড়ে আনন্দ আহরণ করা যায়—এরূপ একটি পার্কে ছুটির দিনে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকের সমাগম হবে এটাই স্বাভাবিক। হয়ও তাই। তা ছাড়া যাতায়াতের সুবিধার জন্য হাইড পার্কের চারদিকেই রয়েছে টিউব স্টেশন। এসব সুবিধা থাকার কারণেই হাইড পার্ক দুর্দমনীয় আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

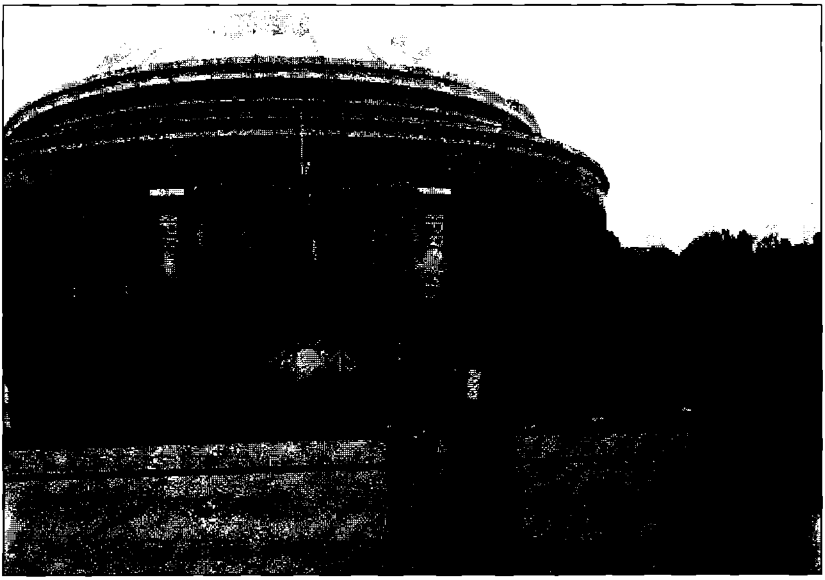

রয়েল আলবার্ট মেমোরিয়াল। ছবিতে জিয়া ও এমিলিকে দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

আজ আমরা তিনজন হাইড পার্কে কিছুটা সময় কাটানোর জন্যই রওনা হলাম। স্মৃতিবিজড়িত হাইড পার্ক। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সাল অবধি আমি যখন লন্ডনে পাকিস্তানের ডেপুটি নেভাল অ্যাডভাইজার ছিলাম তখন বীথি ও দীপ্তি আমার দুই কন্যা ছিল শিশু এবং তাদের খাতিরেই আমাকে এবং আমার গৃহিণীকে প্রতি মাসেই দু-চারবার হাইড পার্কে আসতে হতো। বিশেষভাবে মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা যখন দীপ্তির জন্মলগ্নে আমার গৃহিণী উলউইচ মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন এবং আমাকে একলাই বীথিকে দেখাশোনা করা, ঘর সামলানোর কাজ এবং অফিসের কাজ করার গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল সেই দিনগুলোর কথা আজও মনের আঙ্গিনায় ভাস্বর। ছুটি পাওনা ছিল না বলে আমাকে পুরো সময় অফিস করতে হয়েছিল। তখন সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে বীথিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে, তার সারাদিনের প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় ও আহার সামগ্রী নিয়ে গাড়িতে উঠতে হতো এবং বীথিকে ক্যান্ডি ক্লাবে (কর্মরত দম্পতিরা তাদের শিশুদের সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে রেখে কাজে যেতে পারে) রেখে আমাকে ঠিক নটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে হতো। দুপুরে এক ঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেকের সময় বীথিকে ক্লাব থেকে সংগ্রহ করে হাইড পার্কে চলে যেতাম এবং রাস্তার ধারেই গাড়ি পার্ক করে বাপ-বেটিতে রাস্তার ধারে বেঞ্চে বসে আহার পর্ব সমাধান করে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে পুনরায় বীথিকে ক্লাবে রেখে আমি আমার কাজে অফিসে ফেরত আসতাম। প্রায় ১০ দিন এভাবে চলেছিল। হাইড পার্ক তাই আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। এত কঠিন রুটিনের মধ্যে আমি কি খেয়ালখুশিমতো কোনো বাহানায় অফিস কামাই করতে পারতাম না? পারতাম। অবশ্যই পারতাম যদি আমার মনোবৃত্তি আমাদের দেশীয় মনোবৃত্তির অনুরূপ হতো। লন্ডনে তৎকালে এভাবে কেউ অফিস থেকে অনুপস্থিত থাকত না। কাজকে কোনো বাহানায় ফাঁকি দেয়াটাকে ঘৃণার চোখেই সবাই দেখত।

সেই হাইড পার্কে আজ যাচ্ছি এবং জিয়া পুরনো দিনের সব কিছুই দেখতে চায়, সেসব দিনের কথা শুনতে চায় এবং মনে হয় তার মায়ের স্মৃতি মনে গেঁথে নিতে চায়। আমাকে তাই শুরু করতে হলো নাইটসব্রিজ স্টেশন থেকে। এই স্টেশনটিই হলো লাউন্ডস স্কোয়ারের নিকটতম টিউব স্টেশন। এখান থেকে স্লোন স্ট্রিট পার হয়েই লাউন্ডস স্কোয়ারে এসে পৌঁছতাম এবং এরই ৩৫ নম্বর বাড়ির তিন তলায় ছিল আমার অফিস। বহু দিনের স্মৃতি বিজড়িত লাউন্ডস স্কোয়ারটি পুনরায় চারদিকে ঘুরে দেখলাম। সেই আগের মতোই আছে। আমার

www.pathagar.com

অফিসের তিনতলার জানালার দিকে তাকিয়ে মনে হলো ৫০ বছর আগের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। সেসব দিনের কথা জিয়া ও এমেলিকে বলতে বলতে এগিয়ে চললাম হাইড পার্কের দিকে এবং নাইটসব্রিজ রোড অতিক্রম করে আলবার্ট গেট পার হয়ে ঢুকে পড়লাম হাইড পার্কে।

১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা অষ্টম হেনরি রাজ-রাজড়াদের বিনোদনের জন্য এই স্থানটিকে বরাদ্দ করেন। এর আয়তনের তুলনামূলক চিত্র পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরতে চাই। এই পার্কটি আমাদের ঢাকার বৃহত্তম রমনা পার্ক থেকে মাত্র ১৬ গুণ বড়। পরিবেশবেত্তারা আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করছেন যে, নগর জীবনকে সুস্থ, শান্তিপূর্ণ এবং অপরাধমুক্ত রাখতে হলে পরিবেশ রক্ষা করা একান্ত কাম্য। তাই আজ বিশ্বব্যাপী সব বড় বড় শহরে প্রতি নগর পাড়ায় পার্ক সৃষ্টির দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনাকারীরা এ বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করে থাকে। লন্ডন নগরী কিন্তু এদিক থেকে বেশ পরিকল্পিতভাবেই গড়ে উঠেছে। ১২০০ বর্গমাইলের এ শহরে প্রতি এলাকাতেই তাদের নিজস্ব পার্ক রয়েছে। তা ছাড়া সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য বৃহত্তর আয়তনের পার্ক লন্ডনের নানা স্থানে বিরাজমান। কয়েকটি বৃহৎ আয়তনের পার্কের উল্লেখ না করে পারছি না। টেমস নদীর দক্ষিণে অবস্থিত ব্যাটারসি পার্কে চিত্তবিনোদনের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মনে পড়ে ১৯৫৭-১৯৫৯ সালে লন্ডনের চেলসি অঞ্চলে থাকার সময়ে গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রায় বিকেলেই লন টেনিস খেলার জন্য ব্যাটারসি পার্কে যেতাম সপরিবারে। আমি যখন টেনিস খেলতাম তখন গৃহিণী মেয়েদের নিয়ে বিনোদন পার্কের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। রাজকীয় পার্ক রয়েছে আরো অনেক যেমন রিজেন্ট পার্ক, গ্রিন পার্ক, সেন্ট জেইমস পার্ক, কেনসিংটন গার্ডেন, রিচমন্ড পার্ক, ক্ল্যাপহাম কমন, ফিনসব্যারি পার্ক, গ্রিনউইচ পার্ক, উইম্বলডন পার্ক যা টেনিস টুর্নামেন্টের জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাত। তাছাড়া এপিং ফরেস্টের উল্লেখ করা অপরিহার্য যে সম্বন্ধে আমি এই বইয়েরই ১২তম অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছি। মনের ক্রোধ, আক্রোশ, ক্লান্তি, অশান্তি, অবসন্নতা দূর করার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শান্ত পরিবেশ। এ ব্যাপারে আমার বই 'মার্কিন মুলুক'-এর স্যাম হিউস্টনের দেশের– গ্যালভেস্টন দ্বীপে মুডি গার্ডেনের বিবরণ দিতে গিয়ে ন্যাচার থেরাপির (Nature Therapy) উল্লেখ করেছিলাম। অত্যধিক আবেগজনিত কারণে মানসিক চাপ অবদমনে প্রকৃতির অবদান অনস্বীকার্য। মুডি গার্ডেনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা রোগীদের

www.pathagar.com

চিকিৎসার জন্য শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শান্ত পরিবেশ রোগমুক্তির সহায়ক। লন্ডনবাসীদের সৌভাগ্য যে, তারা পার্কে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে এবং নিত্যদিনের মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমাদের দেশবাসী প্রকৃতিকে উচ্ছেদ করে মনে হয় আনন্দ পায় তাই পার্ক কোথাও গজিয়ে উঠলেই তা উৎখাত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হাইড পার্কের সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি দুটোই আছে। মার্বেল আর্চের কাছে একটি স্থান আছে যা স্পিকার্স কর্নার নামে পরিচিত। এটা একটা বক্তৃতা মঞ্চ এবং এখানে বক্তা যা খুশি বলতে পারে কেউ তাতে বাধা দেবে না এবং সত্যতা যাচাই করে বক্তার বিরুদ্ধে কোনো পুলিশি তৎপরতাও গ্রহণ করা হবে না কিংবা কেউ বক্তার বক্তৃতার অংশ উল্লেখ করে আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবে না। এই মঞ্চ হচ্ছে ক্রুদ্ধ মানুষের স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের স্থান। এরূপ একটি মঞ্চ সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ স্থাপন করেছিলেন। গুলিস্তানে জিরো পয়েন্টের কাছে এই মঞ্চটি এখনো বিদ্যমান। বাকস্বাধীনতা কামীরা এখানে এসে নির্ভয়ে মনের কথা শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে পারবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে সারগেল টর্গ হচ্ছে এরূপ একটা স্থান যার বর্ণনা আমি আমার লিখিত বই 'সুইডেন শান্তির দেশে'– এর দ্বাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি। হাইড পার্কে শুনেছি, যে সব বক্তৃতা হয় তা

আলবার্ট মন্যুমেন্ট

www.pathagar.com

অধিকাংশ সময়ই অতি উঁচুমানের হয় যেখানে সামাজিক সমস্যাবলী, ধর্ম ও তার প্রভাব, আইন-আদালত ও ন্যায়-নীতির ওপর সূক্ষ্ম কটাক্ষ থাকে। অলিখিত নিয়ম হচ্ছে যে, বক্তৃতা হতে হবে মতামত গঠনের উদ্দেশ্যে- লোক ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যে নয়।

হাইড পার্কের সুখ্যাতির গল্পই এতক্ষণ হলো। এবার অন্য দিকটাতেও আলোকপাত করা যাক। হাইড পার্ক এবং কেনসিংটন গার্ডেনের কোনায় সংস্থাপিত এক নোটিশ বোর্ডে স্পষ্টাক্ষরে লেখা দেখলাম যার বাংলা তর্জমা হচ্ছে 'সন্ধ্যার পর এখানে ডাকাতির ভয় আছে বলে অনুগ্রহ করে সব দর্শনার্থী এই স্থান পরিত্যাগ করবেন' এটা হাইড পার্কের সুখ্যাতি মোটেই নয়।

হাইড পার্কের কুখ্যাতির গল্প বলতে গেলে অবশ্যই বলতে হবে যে সন্ধ্যার পর এই পার্কের অনেক অংশ বারবণিতাদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে পত্রপত্রিকায় দেখতাম, বারবণিতাদের অবৈধ কার্যকলাপ রোধ করার জন্য প্রায়ই পুলিশি হামলা হতো এবং ধৃত বারবণিতাদের আদালতে হাজির করা হতো। সেকালে প্রতি সটে বারবণিতারা ১০ শিলিং করে চার্জ করত যদি সটটি হাইড পার্কের কোন বুসের আড়ালে হতো। আর যদি বারবণিতা তার গৃহে নিয়ে যেত তাহলে রেট হতো ২ পাউন্ড যার মধ্যে গৃহের মালিকের ভাগ থাকত এক পাউন্ড। অপরাধ সম্বন্ধীয় পত্রপত্রিকার বিশ্লেষণে দেখা যেত যে, অবৈধ যৌনাচারের জন্য আদালত ১ পাউন্ড করে জরিমানা করত। কিন্তু এই পরিমাণ জরিমানাতে অপরাধ মোটেই কমতো না। অপরাধ বিশ্লেষকরা তখন সুপারিশ করল যে, জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হোক। তাই করা হলো। বারবণিতারাও তাদের রেট বৃদ্ধি করল এবং যৌন ব্যবসা চলতে থাকল তবে একটু স্তিমিত আকারে। আইন প্রয়োগ কর্তৃপক্ষ এতেই সন্তুষ্ট। কেন সন্তুষ্ট এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, যদি জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ কিংবা চারগুণ করা হতো তাহলে হাইড পার্কের এই ধরনের অপরাধ সম্পূর্ণভাবে দমিত হতেও পারত তবে ভয় ছিল যে, যৌনপিপাসুরা তখন তাদের পিপাসা মেটানোর জন্য হয়তো ভদ্রপাড়ায় চলে যেত এবং তাতে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হতো। তাই হাইড পার্কের অবৈধ যৌন ব্যবসা চলতেই থাকল।

হাইড পার্কের পূর্ব-উত্তর কোণে মার্বল আর্চ মেমোরিয়াল এবং পশ্চিম দিকে কেনসিংটন প্যালেস অবস্থিত। এর মাঝে পার্কের ভেতরেই আলবার্ট মনুমেন্টটি বিরাজ করছে। আলবার্ট মনুমেন্টের দক্ষিণে কেনসিংটন রোড সংলগ্ন যে মনোমুগ্ধকর সংস্থিতি দেখা যায় তা হচ্ছে আলবার্ট হল। স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে ডিম্বাকৃতি এই হলটি যার অভ্যন্তরীণ পরিমাপ হচ্ছে লম্বায় ২১৯

www.pathagar.com

ফিট এবং প্রস্থে ১৮৫ ফিট। ভেতরটা রোম নগরীর কলোশিয়ামের মতো অর্থাৎ চারদিকেই বসার গ্যালারি এবং মধ্যখানে রঙ্গ মঞ্চ। তফাৎ হচ্ছে যে কলোশিয়াম ছাদবিহীন কিন্তু অ্যালবার্ট হলের মাথার ওপর ১৩৫ ফিট উঁচুতে একটা বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ গম্বুজ বসানো আছে। এই হলটির প্রায় চারদিকেই গ্যালারি শুধু একটা দিকে একটা স্টেজ বা মঞ্চ নির্মাণ করা আছে যা অরকেস্ট্রা অর্থাৎ বাদক দলের আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত আছে। চারদিকের গ্যালারিতে উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য হলের মেঝেতে সমবেত নাট্যগীত পরিবেশিত হয়। এক সঙ্গে প্রায় ৮০০০ দর্শক নাট্যগীত উপভোগ করতে পারে। হলের উপরিভাগে চিত্রপ্রদর্শনী গ্যালারি আছে এবং সেখানেও প্রায় ২০০০ দর্শকের সমাগম সম্ভব।

রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ১৮৬৭ সালে এই হলটি এবং তৎসংলগ্ন সংস্থিতিসমূহ নির্মাণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি কাজটি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়া সব কাজ শেষে আলবার্ট মেমোরিয়াল হল হিসেবে এই হলটির ফলক উন্মোচন করেন। সেই যুগে এই হল নির্মাণে খরচ হয়েছিল দুই লাখ পাউন্ড স্টারলিং।

Royal Albert Hall-এর উত্তরে অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল সংস্থিতিটি অবস্থিত। রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের সম্মানার্থে এবং তার স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্যুমেন্টটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে প্রিন্স অ্যালবার্টের মূর্তি স্থাপিত হয় এই মনুমেন্টের শিখরে তখন এর উচ্চতা হয় ১৭৫ ফিট।

ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সম্রাজ্ঞী ছিলেন তাই তার সম্বন্ধে পাঠকদের কিছু না জানিয়ে চলে যাওয়াটা অবিমৃশ্যকারিতা বলেই বিবেচিত হবে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যুর পর ১৮ বছর বয়সী আলেকজান্দ্রিয়া ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯ বছর বয়সে রানী ভিক্টোরিয়া প্রিন্স অ্যালবার্টকে বিবাহ করেন এবং তাদের ২২ বছরের অত্যন্ত সুখী বিবাহিত জীবনে রানী ৯টি সন্তানের জন্ম দেন। ২২ বছরে ৯টি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাকে প্রায় সব সময়ই দৈনন্দিন রাজকার্য থেকে অব্যাহতি নিতে হয় এবং তার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। প্রিন্স অ্যালবার্ট অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই রাজকার্য পরিচালনা করেন এবং রানীর পূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। রানী প্রিন্স অ্যালবার্টকে রাজার উপাধি দিতে চান কিন্তু রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রজারা এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনি। তবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে

www.pathagar.com

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রিন্স অ্যালবার্টকে 'প্রিন্স কনসর্ট' উপাধিতে ভূষিত করে।

রানী ভিক্টোরিয়া প্রিন্স কনসর্টকে এত ভালোবাসতেন যে, ১৮৬১ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে যখন প্রিন্স টাইফয়েড রোগে মৃত্যুবরণ করেন তখন থেকে আমরণ রানী ভিক্টোরিয়া শোকের নিদর্শনস্বরূপ কালো কাপড় পরিধান করতেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রিন্সের ব্যক্তিগত কামরায় কোন পরিবর্তন আনতে দেননি এবং প্রিন্সের খাস বেয়ারার ওপর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতিদিন সকালে প্রিন্সের সেভিংয়ের জন্য কামরায় যেন গরম পানি রেখে দেয়া হয়।

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ছিল ৬৪ বছর (১৮৩৭ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত)। ব্রিটিশ ইতিহাসে কোনো রাজা কিংবা রানীর এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ রাজত্বকাল। বিয়ের মাত্র ২২ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স কনসর্টের মারা যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় রানীর একক যাত্রা। ব্রিটেনের ইতিহাসে মহান সম্রাজ্ঞী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তার সময় ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলো তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসে এই বিখ্যাত রানী এই ধরাধাম ত্যাগ করেন।

আমরা অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল দেখার পর উত্তর দিকে কেনসিংটন গার্ডেনের সীমানায় অবস্থিত 'Bayards watering Place' এবং তৎসংলগ্ন 'The Fountains' দেখতে গেলাম এবং গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর বসে কিছু পানাহার করলাম এবং এতেই চলার পথের ক্লান্তি দূর হলো। আবারও এগিয়ে চললাম এবং বাগান পেরিয়ে আমরা ল্যাঙ্কেস্টার গেট টিউব স্টেশন থেকে পাতাল রেলে পিমলিকো স্টেশনে পৌঁছলাম। এবার আমাদের গন্তব্য পথ হচ্ছে টেইট গ্যালারি। মিলব্যাংক রাস্তার ধারে টেইমস নদীর তীরে টেইট গ্যালারিতে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জিয়া কিছুক্ষণের জন্য হলেও এই প্রসিদ্ধ টেইট গ্যালারিটি দেখতে চায়। এমিলি ইতালির বাসিন্দা তাই বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর যথা মাইকেল এঞ্জেলো, বারনিনি, লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বেনিনি প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত আর্টিস্টদের ছবি দেখে অভ্যস্ত তাই জিয়ার সাথে গ্যালারি দেখতে না গিয়ে আমার সাথে বাগানে বসে গল্প করে সময় কাটানোই পছন্দ করল।

বিকেল ৫টার দিকে জিয়া টেইট গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এল। এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা। আমরা তাই ভিক্টোরিয়া টিউব স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। যাত্রাপথে সুন্দর একটা পার্ক নজরে এল এবং পার্কের সামনেই রাস্তার ধারে লিখা

www.pathagar.com

আছে 'Eye is the window of the soul' কোন বিখ্যাত লোকের উক্তি কি না তা যাচাই করার উপায় নেই তবে কথাটা সত্য বলেই মনে হলো। এ ধরনের উক্তি চিন্তার খোরাক যোগায় এবং এর ব্যাখ্যা নানাজন নানাভাবে দিতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, চোখ হচ্ছে বাতায়ন যা দিয়ে ভালো-মন্দ সব কিছুই দেখা যায় এবং মন কিংবা অন্তঃকরণ যা চায় তাই আমরা দেখে থাকি।

একটু এগোতেই ওয়েস্ট মিনিস্টার ক্যাথিড্রেলের সুউচ্চ মিনার যা অনেকটা বাইজেন্টাইন স্টাইলে নির্মিত তা আমাদের নজরে এল। আমরা পাশ দিয়ে আর একটু অগ্রসর হতেই আমাদের ঈপ্সিত টিউব স্টেশনটি পেয়ে গেলাম। পায়ে হাঁটার পর্ব আজকের মতো এখানেই শেষ করে ঘরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

www.pathagar.com

উনিশ.

পথ চলার শেষ দিন

জিয়ার ফরমায়েস হচ্ছে যে পুরনো দিনে লন্ডনে আমরা কোথায় থাকতাম তাই তাকে দেখাতে হবে। সে অনুযায়ী লন্ডনের রাস্তায় আজ ৪ আগস্ট সোমবার বেরুলাম সকাল ১০টায়। টিউবে করে প্রথমে গেলাম টটেনহাম কোর্ট রোডে। সেখানেই নাঈম ও খুসীর অফিস। নাঈম হচ্ছে বীথির সাবেক স্বামীর ভাসুর ও খুসী হচ্ছে ভাসুর বউ। খুসীর আর একটা পরিচয় হচ্ছে, সে আমার অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ার শাখাওয়াত হোসেনের ছোট বোন। লন্ডনে গেলেই তারা আমার খোঁজখবর নেয় এবং আমাকে মাত্রাধিক খাতির-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন করে। আমি তাদের সাথে দেখা করতেই গিয়েছি অনেকটা রথ দেখা ও কলা বেচার মনোভাব নিয়ে। পথ চলতে চলতেই কিছু সামাজিকতাও করে নেয়া হলো। মন্দ কী? তারা অফিসেই ছিল এবং আমাদের বেশ আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করল। আজ বেশ গরম পড়েছে তাই চা কিংবা কফির পরিবর্তে আমাদের পরিবেশন করা হলো ঠাণ্ডা কোমল পানীয় দিয়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপচারিতার পর আমরা বেরিয়ে এলাম।

টটেনহাম কোর্ট রোডের মোড়ে রাস্তার ওপরই দোকান সাজিয়ে বসেছে এক রকমারি হাতঘড়ির দোকানদার। বিভিন্ন ধরনের ঘড়ি। মাত্র পাঁচ পাউন্ড করে। এর-ওর জন্য কিনলাম সর্বমোট ৬টা ঘড়ি। প্রত্যেকটি ঘড়িই সুন্দর বাক্সে রক্ষিত। উপহার দেয়ার জন্য খুবই উপযোগী। নিজামের জন্য কিনলাম একটা মগ। তার মগ সংগ্রহের বাতিক আছে এবং তার বাড়ির দেয়াল ধরে সারি সারি মগ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে শত শত মগ। দেশ-বিদেশ থেকেই সংগৃহীত হয় এসব মগ। হানিফ সংকেত যিনি টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করে সুখ্যাতি

www.pathagar.com

অর্জন করেছেন তিনি নিজামের মগ সংগ্রহের কীর্তিকলাপ নিয়ে মগের মুল্লুক নামক একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিজামের জন্য যে মগটি কিনলাম তাতে লিখা ছিল 'My son went to London and brought for me this louzy mug' যার অর্থ দাঁড়ায় 'আমার পুত্র লন্ডনে গিয়ে আমার জন্য এই বাজে মগটি কিনে এনেছে'। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ কথা। মগটি তার ভাণ্ডারে ঝুলি করে নিয়েছিল এবং অনেকেরই হাসির খোরাক হয়েছিল। যদিও বাজে মগটি আমি দিয়েছি কিন্তু সকলেই কটাক্ষ করে নিজামের পুত্র রাশেদের দিকেই ।
Christopher Noris কর্তৃক লিখিত 'DECONSTRUCTION' বইটি কেনার জন্য জিয়া বিশ্ববিখ্যাত FOYLES এর দোকানে যেতে চায়। বইটি কিনে আমরা পথে নামব এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অতি নিকটেই অবস্থিত FOYLES-এর দোকানে গেলাম কিন্তু বইটি সেখানে পাওয়া গেল না। নিকটস্থ আর একটি বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'BORDERS'-এ গেলাম সেখানেও তথৈবচ। তবে তারা বলে দিল 'গাওয়ার স্ট্রিটে' এর একটা দোকানের ঠিকানা দিয়ে দিল। প্রায় মাইলখানেক হেঁটে আমরা সেই দোকানে এসে বইটি কিনলাম। বইটি কিনে জিয়া স্বস্তি ফিরে পেল এবং এবার পথ চলার জন্য তৈরি হলো।

ইডিথ টিরেসের সামনে দাঁড়িয়ে লেখক। এককালের নিজ বাসভবন

জিয়া দেখতে চায় লন্ডনে তার মা কোন বাড়িটিতে থাকত। তাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে ইউস্টন স্কোয়ার টিউব স্টেশন পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান থেকে টিউবে করে স্লোন স্কোয়ার টিউব স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে পদযাত্রা শুরু হলো কিংস রোড ধরে। মাইলখানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে যাওয়ার পর হাতের ডান দিকে পেলাম 'ইডিথ গ্রোভ' রাস্তা। ইডিথ গ্রোভ রাস্তা ধরে শ খানেক ফিট উত্তর-পশ্চিমে গিয়েই বাঁ দিকে পেলাম 'ইডিথ টিরেস' রাস্তাটি। এই রাস্তার কোণের বাড়িটি হচ্ছে ১০ নম্বর ইডিথ টিরেস। এখানেই আমরা ১০ সেপ্টেবর ১৯৫৬ থেকে শুরু করে ১৭ অক্টোবর ১৯৫৯ পর্যন্ত বসবাস করেছিলাম। সুন্দর দোতলা বাসাটি আমাদের মনের মতোই ছিল। জিয়া এই বাসা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে চায় এবং আমারও পূর্বস্মৃতি মনে এসে ভিড় করল এবং তাকে জানালাম যে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর চেলসি অঞ্চলে মিসেস ফোয়ার এই বাসাটি পেয়েছিলাম ১১ গিনি করে সাপ্তাহিক ভাড়ায়। কিন্তু সেকালে ডেপুটি নেভাল অ্যাডভাইজারের বাসা ভাড়ার সরকারি বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে ৯ গিনি (এক গিনি হচ্ছে ১ পাউন্ড এক শিলিং)। অতিরিক্ত ২ গিনি বরাদ্দের জন্য আমাকে আমাদের হাইকমিশনার জনাব ইকরামুল্লার কাছে আবেদন করতে হয়েছিল এবং তিনি যথারীতি বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঘর বদলানো লন্ডনে বেশ কঠিন আবার বেশ সোজাও। নিজের প্রচেষ্টায় ঘর বদলাতে গেলে প্যাক করা প্রতিটি বাক্স-পেঁটরা নিচে নামিয়ে আনা এবং ট্যাক্সি করে নতুন বাসায় আনা এবং সেগুলো বাসায় তোলা। সাহায্যের জন্য কোন প্রকার দৈনিক মজুর পাওয়া যায় না বলে ঘর বদলানোর কাজটি অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। অবশ্য অতি সহজেই এই কাজটি কোনো এজেন্টের মাধ্যমে করান যেত তবে মাশুল দিতে হতো অত্যধিক। আমাদের অত টাকা ছিল না বলে ঝামেলাটা নিজেরাই কাঁধে নিয়েছিলাম।

ইংল্যান্ডে গৃহ প্রবেশটা অনুষ্ঠানের মধ্যেই করার রেওয়াজ আছে। তাই মনে পড়ে সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানটি করলাম। ক্যাপ্টেন এস এম আহসান এবং তার গৃহিণী, কমান্ডার এস বি সেলিমি এবং তার পত্নী, লে. কমান্ডার এবং মিসেস আরশাদ, লে. এবং মিসেস কিজালবশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আমার গৃহিণীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পার্টিটি সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। সেলিমি সাহেব ও আমি ছাড়া অন্যরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে অ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

চেলসি এলাকাতে এই বাড়িটিতে ছোট ৯ মাস বয়েসের কন্যা বীথিকে নিয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিলাম এবং বছর না পেরুতেই আমাদের ছোট কন্যা দীপ্তির আগমন- আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম তিনটি বছরকে করে রেখেছিল আনন্দঘন স্বপ্নময়। আজ ৪ আগস্ট ২০০৩ সালে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং জিয়ার নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। মনে হচ্ছে যে, সে যেন উপলব্ধি করছে যে, ঘরের ভেতরে তার মা ঘর কন্যা নিয়ে ব্যস্ত এবং এক রুম থেকে অন্য রুমে চলা ফেরা করছে। তাই সে জানতে চাচ্ছে কটা রুম ছিল এবং নিচের তলায় এবং ওপরের তলায় কী কী কাজে রুমগুলো ব্যবহৃত হতো ইত্যাদি। কোথায় মা বাজার করতে যেত- কোথায় ছিল বীথির প্রথম কিন্ডার গার্টেন স্কুল- আমাদের পার্টটাইম মেইড কোথায় থাকত- কোথায় আমরা বিকেলে বেড়াতে যেতাম ক্লিনিক কোথায় অবস্থিত ছিল ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমিও যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ির সামনের চেলসি কমিউনিটি চার্চটি এবং সামনের ছোট বাগানটি ঠিক আগের মতোই আছে। সব এলাকাই যেন স্থির অচঞ্চল এবং অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং প্রশ্ন করছে যে, এতগুলো বছর কোথায় ছিলাম? হারিয়েই গিয়েছিলাম- তাই খুঁজে খুঁজে আজ আবার এসেছি ভালোবাসার টানে। সাথে নিয়ে এসেছি আমার একমাত্র পুত্রকে যেও এই বাড়িটিকে ভালোবাসে কেননা এই বাড়ির সাথে নাড়ির যোগ আছে তার মায়ের।

হঠাৎ নজরে পড়ল 'FARLEY & CO' এর SALE বিজ্ঞপ্তির সাইনবোর্ড। বাড়িটি বিক্রি হবে। জিয়া বলল যে, তার পয়সা থাকলে বাড়িটি কিনে ফেলত। কিন্তু কেন? এর উত্তরে সে বলল মার স্মৃতিকে জাগরিত রাখার জন্য। নিছকই ভাবপ্রবণ খেয়াল। তবু মনে হলো আজকের পদযাত্রাটি সার্থক হয়েছে এবং সুখপ্রদ হয়েছে।

বাড়ি দেখা হলো বটে কিন্তু মনের চোখে সেই ৪৫ বছর আগের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলো নানা দিক থেকে হানা দিতে থাকল। আমরা পশ্চিম দিকে কিংস রোডের সমান্তরাল রাস্তা FULHAM ROAD-এর দিকে যাচ্ছি। নজরে এল ১০ নং এডিথ টিরোস বাড়ির কাছেই CHELSEA WESTMINISTER HOSPITALটি। এই হাসপাতালটি আমার স্ত্রীর জীবনের কয়েকটি দিন ঘিরে এক হেঁয়ালিপনার আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছিল। হাসপাতালের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই সেই স্মৃতি মনে ভেসে উঠল এবং জিয়ার সাথে ভাগ করে ভোগ করব বলে তার মার কীর্তির কথা গল্পচ্ছলে বলতে শুরু করলাম। জিয়া খুবই আগ্রহসহকারে শুনতে থাকল। কার্য উপলক্ষে আমাকে দিনদুয়েকের জন্য লিভার-

www.pathagar.com

পুল যেতে হয়েছিল এমন সময় যখন আমার স্ত্রী শারীরিক ও মানসিক ব্যা একটু অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে তাকে কোনো ডাক্তারের কা নিয়ে গিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখানো হোক কিন্তু আমি তেমনটি গা করিনি। আমি বলেছিলাম তুমি নিজেই তো আমাদের কমিউনিটি ডাক্তার মিকলোজয়েস্কির সাথে দেখা করতে পার। মেয়েদের নিয়ে তো তুমি একাই যাও। এতে আমার গৃহিণীর অভিমান হলো এবং তিনি একদম চুপ মেরে গেলেন। কেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ করছেন, অসুখটা কি তা আর জানানোর প্রয়োজন মনে করলেন না। আমাকেও লিভারপুলে যেতেই হলো। দু দিন পর এসে দেখি মিসেস মরফি, বীথি ও দীপ্তির বেবী সিটার-বাচ্চাদের নিয়ে বাসায় অবস্থান করছে এবং আমার গৃহিণী চেলসি ওয়েস্ট মিনিস্টার হাসপাতালে চেকআপের জন্য ভর্তি হয়ে গেছেন। খবরটি পাওয়ার সাথে সাথেই আমি হাসপাতালে গেলাম এবং গিয়ে শুনলাম যে, মেডিকেল চেকআপের জন্য তিনি ভর্তি হয়েছেন। আমার অনুপস্থিতিতে কি এমন হলো যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো তা জানার চেষ্টা করেও আমার গৃহিণীর কাছ থেকে জানতে পারলাম না। অগত্যা আমাকে হাসপাতালে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হলো এবং তখনই রহস্যটি উদঘাটিত হলো।

মধ্যবয়সী ডাক্তার আমাকে তার চেম্বারে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা কবে ছুটিতে গিয়েছি। আমার কাজের ধরনটি কেমন। আমরা সাপ্তাহিক বিনোদনের জন্য কী করে থাকি। বাড়িতে গৃহিণীকে ঘর কান্নার জন্য আমার সাহায্যের পরিমাণ কতটা। আমি ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে আছি তাই অতিথি আপ্যায়নের মাত্রা স্বভাবতই অধিক– সে সব ক্ষেত্রে আমি সর্বোতভাবে স্ত্রীকে সাহায্য করি কি না। এভাবে আমাকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করে শেষ পর্যন্ত জানালেন যে, আমার স্ত্রীর শারীরিক কোনো অসুস্থতা না থাকলেও রক্তহীনতার জন্য বেশ দুর্বলতা আছে। মানসিকভাবে তিনি বেশ অবসাদগ্রস্ত তবে কোন চিন্তার কারণ নেই। স্ত্রীর সাথে আরো হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রবীণ ডাক্তার নবীন ডিপ্লোমেটকে উপদেশ দিলেন। ডাক্তার নিজেই বললেন যে, আমার স্ত্রী বাহ্যত হাসিখুশি থাকলেও ভেতরে ভেতরে একাকিত্বে ভোগেন। তিনি খুবই চাপা এবং অভিমানী। তবে অত্যন্ত দৃঢ় মনের অধিকারী। ডাক্তার শেষ কথাটি যা বললেন তার অর্থ হচ্ছে স্ত্রী অসুস্থতার জন্য আমি বেশ কিছুটা দায়ী। ভাবনার কিছুই নেই তবে স্ত্রীকে আরো বেশি সঙ্গ দিতে হবে এবং আরো বেশি হাসিখুশি

www.pathagar.com

রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

জিয়া আমার সব কথা শুনে বল,ল তার আম্মার প্রতি আমার ব্যবহার কখনো খুব মধুর ছিল না। তার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার কিছু বলারও ছিল না। স্ত্রী গত হয়েছেন অর্ধ যুগ আগে এবং তার পুণ্য স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি মিষ্টিমধুর ব্যবহার করাটা বোধহয় আমার স্বভাবগত নয় তবে স্ত্রীকে ভালোবাসা এবং তার প্রতি মমত্ববোধের অভাব বোধ হয় কোনোকালেও ঘটেনি।

আমরা আরো এগিয়ে চললাম। জিয়া জিজ্ঞেস করল, চেলসিতে আমরা কেন থাকতে এলাম। এর পেছনে কোন ইতিহাস নেই। স্ত্রী ও ৮ মাসের কন্যাসহ ১৯৫৬ সালের অগাস্টের ২৫ তারিখে প্রথম লন্ডনে এলাম তখন লে. কমান্ডার আরশাদ ৮ নং ক্রেনলি গার্ডেনে একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বাসা আমাকেই খুঁজে নিতে হবে। অফিসের কাছে ভদ্রপাড়া কোনটা হবে তাই নিয়ে ভাবছি এবং বাসা খোঁজাখুঁজি করছি তখন হাইকমিশনের এক স্টাফ জানাল যে, চেলসিতে বাসা পাওয়া যেতে পারে তবে একটু ভাড়া বেশি হবে। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বাসার খোঁজে। দেখতে দেখতে ১৫ দিন পেরিয়ে গেল কিন্তু সুবিধামতো একটি বাসা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চেলসিতেই গেলাম এবং ১০ নং ইডিঅ টিরেসে একটি বাসা দেখে বেশ পছন্দ হলো। সাপ্তাহিক ভাড়া ১৩ গিনি আমার সরকারি বরাদ্দ থেকে ৪ গিনি বেশি। চেলসিতে ভাড়া বেশি কেন, তার কারণ হচ্ছে এটা অভিজাত এলাকা হিসেবে লন্ডনে সুপরিচিত ছিল। খালার বয়সী বাড়ির মালিক মিসেস ফোয়া (বিধবা) কেন যেন আমার স্ত্রী ও কন্যাকে প্রথম দৃষ্টিতেই পছন্দ করে ফেললেন। তাই বেশি ভাড়ার কথা তাকে জানাতেই তিনি বললেন যে, আমাদের কন্যার খাতিরে তিনি সাপ্তাহিক ১১ গিনিতে আমাদের কাছে ভাড়া দেবেন।

ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে চেলসি ছিল রাজা রাজড়া এবং আমির অমাত্য, উচ্চপদস্থ রাজসভাসদদের আবাসিক এলাকা। টেইম টেমস্ নদীর তীরে এই স্থানটি ছিল ওয়েস্ট মিনস্টারের খুবই কাছে। ফুলহাম রোড এবং কিংস রোডের আশপাশ অঞ্চল নিয়ে ছিল প্রাচীনকালের চেলসি ভিলেজ। রাজা অষ্টম হেনরি চেলসি ভিলেজেই তার প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং এখান থেকেই নদীপথে

www.pathagar.com

সুসজ্জিত রাজকীয় বার্জ অর্থাৎ বজড়া করে হ্যাম্পটন কোর্টে কিংবা ওয়েস্ট মিনস্টারে অফিস করতে যেতেন।

ব্রিটিশরা অতি রক্ষণশীল তাই চেলসিতে ভাড়া বেশি এটাই সবাই মেনে নিয়েছে। আভিজাত্যের খাতিরে আমরাও এই এলাকায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। প্রথম দৃষ্টিতেই বাড়িটির প্রতি আমার স্ত্রীর ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল তাই বেশি ভাড়া হলেও তিনি এখানে থাকবেন বলে মনস্থির করে ফেললেন। তা ছাড়া মিসেস ফোয়ার আন্তরিকতাও আমার গৃহিণীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অগত্যা নিজেদের পকেট থেকে কিছু দিতে হলেও এই বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্তই আমরা নিয়ে ফেললাম। অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য আমাকে আমাদের হাইকমিশনার জনাব ইকরামুল্লার কাছে আবেদন করতে হয়েছিল এবং তিনি অতিরিক্ত বরাদ্দ অনুমোদন করেছিলেন। আমরা নুতন বাড়িতে উঠেছিলাম ১০ সেপ্টেবর ১৯৫৬ সালে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল কিন্তু ঘরে ফেরার তাগিদ যেন জিয়ার নেই। সে আরো দেখতে চায় কোথায় তার মা নিত্য বাজার করত, কোথায় আমরা সাপ্তাহিক কেনাকাটা করতাম। তাই বাসে করে কিংস রোড ধরে স্লোন স্কোয়ার পর্যন্ত এলাম এবং কোথায় কোথায় আমাদের পদচারণা বেশি হতো তার ধারাবাহিক বিবরণ দিলাম। পিটার জৌনস বীথি ও দীপ্তির অতি প্রিয় দোকান ছিল এবং তাদের পোশাক আশাক সেখান থেকেই কেনা হতো তাও জিয়াকে জানালাম। আমার স্মৃতি মন্থন তাকেও ভাবে আপ্লুত করেছিল। আমরা পৌন স্কোয়ার অতিক্রম করতেই টিউব স্টেশন নজরে এল। সারাদিন পথ চলতে চলতে দুজনেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করলাম।

www.pathagar.com

বিশ.

উপসংহার

একটি মাস ধরে লন্ডনের পথে পথে ঘুরেছি। দেখা-অদেখা অনেক কিছুই আবার নুতন করে দেখেছি। নতুন বলয়ে নতুন যুগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দেখেছি। আমার এই পায়ে হেঁটে লন্ডন দেখার মাঝে অনেক ইতিহাস এনেছি , অনেক তথ্য পরিবেশন করেছি শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে লন্ডনকে শুধু দিব্য চোখ দিয়ে লন্ডনের খোলসটা দেখেই ক্ষান্ত না হয়ে অন্তরটা দেখার জন্য অনেকখানি ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য বেশ কিছু গল্পের অবতারণা করেছি। আশা করি পাঠক আমার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন।

উপসংহারটিকে একটি ফুলের ঝুড়ির আদলে আমার পাঠকের সামনে পেশ করতে চাই। এখানে অনেক কিছুই আছে । সুধী পাঠক নিজেদের চাহিদামতো তথ্য যেন সংবলিত ফুলটি তুলে নেবেন– এটাই আমার আশা। তবে অন্ধের হাতি দেখার মতো না হয়ে যায়। তাই আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যেন একবার পুরো বইটিতে চোখ বুলিয়ে নিন। তাহলে ব্রিটেনকে এবং ব্রিটিশ জাতিকে বেশ ভালোভাবে চিনতে পারবেন।

আমি যা দেখেছি তাই লিখেছি। এর ভালো-মন্দ বিচার করবেন সুধী পাঠক। আমি কোনোভাবেই কাউকে প্রভাবান্বিত করতে চাই না বলেই এখানেই এই বইটির ইতি টানলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কমোডোর (অব.) এম আতাউর রহমান

নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রভাকরদি গ্রামে সম্ভ্রান্ত মিয়া পরিবারে ১৯২৬ সালের ১৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান নেভিতে সাব লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগ দেন। ইংল্যান্ডের প্লিমাউথের ম্যানাডন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫১ সালে। দেশে-বিদেশে দীর্ঘ ২৬ বছর নৌবাহিনীতে চাকরির পর ১৯৭৬ সালে কমোডোর হিসেবে নেভি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর নৌ-জীবনের প্রায় আট বছর কেটেছে জাহাজে, সাগর থেকে সাগরে, বন্দর থেকে বন্দরে। চার বছর কেটেছে ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে লন্ডনে ডেপুটি নেভাল অ্যাডভাইজার হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ থেকে '৭৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তাঁকে সপরিবারে গৃহবন্দী করে এবং নভেম্বর ১৯৭৩ সালে ICRC-এর সৌজন্যে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের সচিবের পদমর্যাদায় কাজ করেন এবং ১৯৮৪ সালের ৩১ জানুয়ারি ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের পরও তাঁর জীবনের উত্তাল তরঙ্গ আগের মতোই বইতে থাকে। তিনি একাধারে ইবনে সিনা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সংস্থাটির বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়েন। দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ মানারাত ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এবং ২০০১ সালে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com